কলিকাতা

কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৬৬

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী,

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : সন্তোষকুমার ধর

মুদ্রণ : ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : দেবব্রত বড়ুয়া, অমল মিত্র

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

ব্লকমুদ্রণ : মোহন প্রেস

তিন টাকা

পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে

প্রণাম-নিবেদন

॥ দিল্লী : ১লা অগ্রহায়ণ. ১৩৬৬ ॥

বিপ্লববাদী আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবল তাই নয়, ১৯২১ এর পূর্বে সংগ্রাম বলতে একমাত্র যে আন্দোলন ছিল সে আন্দোলন বিপ্লববাদী।

১৯২১ এর পরে বিপ্লবী আন্দোলন এবং গান্ধীবাদী আন্দোলন সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত এই পর্যায় স্থায়ী হয়। তারপর কিছুকাল যাবৎ দুটি আন্দোলনই স্তিমিত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে তার প্রকৃত অর্থ বোঝা গিয়েছিল। বীজ ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে, অঙ্কুর প্রকাশ না হলে তার অস্তিত্ব ধরা যায় না। যে অবস্থাকে নিস্ক্রিয় অবস্থা ভেবে অবজ্ঞা করা হয়েছিল তার পিছনে ছিল সূক্ষ্ম ক্রিয়ার যুগ।

১৯৪২ এর আন্দোলনকে গান্ধীবাদী গণ্ডীর আন্দোলন বলা চলে না। স্বয়ং গান্ধীজী কারামুক্ত হবার অব্যবহিত পরে বিপ্লব নামে অভিহিত এই আন্দোলনের পিতৃত্ব অস্বীকার করেন। ১৯৪২ এর আন্দোলনটি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদী এবং গান্ধীবাদী আন্দোলনের সমন্বয়প্রসূত বলা যায়। ১৯৪২ এর আন্দোলন এবং নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের ফলস্বরূপ যে বাতাবরনের সৃষ্টি হল, তার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তের মূল কারণ এই। বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা এবার স্পষ্টভাবে বুঝলেন যে গুলিগোলা ও গোরাসৈন্যের সাহায্যে হয়ত আরও কিছুকাল টিকে থাকা সম্ভব কিন্তু তারপর যখন বিদায় নিতে হবে তখন সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হবে। বিলম্ব করলে এমন লোক বা দলের হাতে রাজশক্তি সমর্পন করে চলে যেতে হবে যাদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ রাখাও সম্ভবপর হবে না। সুতরাং কংগ্রেস ও লীগের হাতে শক্তি হস্তান্তরিত করে যবনিকা পতন হল।

এই ক্ষুদ্রপরিসর বইখানিতে বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গৌরবোজ্জ্বল কথা বলা হয়েছে। উত্তর ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে অনেক স্বনামধন্য বাঙালী কর্মী ছিলেন, অপার ত্যাগ ও কর্ম বলে তাঁরা উত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন!

এখন এমন লোকেদের তারস্বরে প্রচারকর্ম চলছে যারা কোনদিনই ত্যাগ ও তপস্যার মূর্তি ছিলেন না, মহান কর্মীও ছিলেন না। এই অবস্থায় কয়েকজন শহীদ ও বিপ্লবীর কাহিনী জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে কি?

মন্মথনাথ গুপ্ত

শুনে খুবই ঘাবড়ে গেলেন। সেই পরিস্থিতিতে মা, ঠাকুমা আর বাবার সকল কথা বুঝবার মতো বয়স তখনো আমার হয় নি। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে আমাদের পারিবারিক বৈঠকে ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের কথা নিয়েই আলোচনা চলছিল। আজো মনে পড়ে, বাবা শেষটায় বলেছিলেন, 'যদি এমন ঘটে, তবে জার্মাণ ভাষাটা শিখে নেবো। একটা কিছু ক'রে খেতে হবে তো।' আমাদের পরিবারের মতো সেদিন আরো কত লক্ষ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভীতিবিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল। সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবার দাখিল হয়েছিল আসন্ন মহাযুদ্ধের কালো অন্ধকারের ছায়ায়!

সে কালের জনসাধারণের যুদ্ধের ব্যাপারে কোনপ্রকার সমর্থন ছিল না। তারা ছিল মনেপ্রাণে যুদ্ধবিরোধী এবং ইংরেজবিরোধী; যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জনগণের যে ধরণের বিরোধিতা ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধকালীন বিরোধিতার স্বরূপ ছিল তা থেকে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের সেই রাজনৈতিক দল যারা এই যুদ্ধের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল, তারা হল বিপ্লববাদী দল। আঠারশো পঁচাশী খৃস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তখনকার কালে কংগ্রেস মুষ্টিমেয় এক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিপ্লবীরাই প্রথম ভারতের জন্য "পূর্ণ স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। তার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা এগিয়ে এলেন। বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিলঃ স্বাধীনতা লাভ করা আর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গৌরবময় মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। বিপ্লবীদের বীরত্ব ও সাহস সেকালের জনসাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তখন আমি বয়সে শিশু হ'লেও সেই সমস্ত কিছুর প্রভাবও আমাকে রীতিমত বিচলিত ক'রে তোলে।

এমনি সময়ে আমাদের দেশে এক শক্তিশালী ব্যক্তির নাম শোনা যেত। তিনি মহাত্মা গান্ধী। অতি প্রিয় এই নাম। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তাঁর আকস্মিক উদয় হয়েছিল, আর তাঁর উজ্জ্বলতা অল্প দিনেই নিভে যায় নি। দিনের পর দিন ঐ নামটি অধিকতর গৌরবযুক্ত ও দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠ্‌ছিল। দেশের আবহাওয়া যখন এমনি হতাশাপূর্ণ, ঠিক সেই সময়েই গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটলো জাতির মুক্তিদূত হিসেবে। তখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র—অহিংসক প্রতিরোধ। পুরাতন বিপ্লবী-দের বিপ্লবাত্মক পন্থার তুলনায় এই পথ অবশ্যই উন্নততর ছিল। গান্ধীজিই প্রথম প্রচার করলেন আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার বাণী; তিনিই প্রথম উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: আমাদের সবাইকে স্বাবলম্বী হ'তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। গান্ধীবাদের এই হ'ল সবচেয়ে বড় শক্তি।

গান্ধীবাদের বিবিধ নীতির বিষয় তখন আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারতাম না। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মতো আমিও তাঁকে সেদিন জাতির মুক্তিদূত বলেই মেনে নিয়েছিলাম। পরে জাতি তাঁকে মহাত্মা নামে সম্মানিত করল। মহাত্মা শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আশ্চর্য এক মোহের সৃষ্টি করেছিল তখন, আর তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়ও ক'রে তুলেছিল। গান্ধীজি এক উদার-হৃদয় মহাপুরুষ হিসাবে "মহাত্মা" আখ্যা যে লাভ করলেন, তা' তাঁর বাণী ও কীর্তি যুগপৎভাবে তাঁরই মহৎহৃদয়ের ও প্রেমপ্রতিভার দ্যোতক। গান্ধীজির ক্ষীণদেহ যেন নিরস্ত্র ভারতের প্রতীক। যে সময়ে গান্ধীজি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এলেন, সে সময় আমাদের এই দেশের সাধ্য ছিল না সহিংস বিপ্লববাদী পন্থায় অগ্রসর হওয়া, কাজেই সে সময়ে অহিংসা পদ্ধতিই ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে গান্ধীজি যথার্থ সময়ে যথার্থ হাতিয়ারই ব্যবহার করেছিলেন।

বালকবয়স থেকেই আমি নানাবিধ শৌর্যবীর্যের কাহিনী পড়তে ভালো-বাসতাম। এই সময়েই বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের সমস্ত বাংলা বই পড়ে শেষ ক'রে ফেলোছলাম। আমাদের দেশের অতি প্রাচীনকালের নানা বীরত্বগাথা, রাজপুত ও মারাঠা বীরদের শৌর্যবীর্যের অপূর্ব সব কাহিনী অতি শিশু বয়স থেকেই আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত

করেছিল। তখন ঐ সব বই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম, কারণ আমার বাবা আমাকে নিষেধ করেছিলেন ঐ ধরনের বই পড়তে! বলা বাহুল্য, লড়াই স্থরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সেই সওদাগরী আফিসের কাজ আর রইলো না। তখন বাবা একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলেন। বাইরের বই পড়া সম্বন্ধে বাবার মত-ও সাধারণ স্কুল-শিক্ষকদের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল না। তাঁর মত ছিল, পাঠ্য বই ছাড়া আর কিছু পড়বার নেই। কিন্তু আমি তো আমার কৌতূহলী মনের তীব্র পাঠ-তৃষ্ণার ফলে একের পর এক সব বই পড়ে শেষ ক'রে ফেল্লাম। বাবা নিষেধ করেছিলেন বলে নিষিদ্ধ ফলের মতো ঐ বইগুলি আমার কাছে আরো রোমাঞ্চকর, আরো রহস্যপূর্ণ বলে মনে হ'ত। এই সময়কার একটি ঘটনার কথা মনে আছে। আমাদের বাড়িতে হঠাৎ একদিন "কল্কিপুরাণ" বলে একখানা বই পেলাম। বইটি পাওয়ামাত্র পড়ে শেষ ক'রে ফেললাম। ঐ বইয়ে রয়েছে, কল্কী হ'ল অবতার, এই অবতার ভারতকে আবার তার পূর্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমার মনে হতে লাগ্‌লো গান্ধীজিই বোধ হয় সেই অবতার। বইটিতে অবশ্য কল্কি অবতারের রূপ বর্ণনায় এমন সব বিষয় ছিল, যার সঙ্গে গান্ধীজির একটুও মিল নেই। কিন্তু আমার শিশুমন তখন গান্ধীজির স্বপ্নে বিভোর। গান্ধীজিই যে কল্কী অবতার, এ ছাড়া আমি তখন আর কিছু ভাবতেই পারতাম না।

এ সময়ে বড়রাও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। গান্ধীজি কে, এ কথাটা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বিরক্ত হয়েই উত্তর দিতেন, "গান্ধীজি—গান্ধীজিই, আবার কে ?" তাঁদের ধরণধারণ দেখে মনে হ'ত এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাওয়া দোষের। এমনি করেই আজকের গান্ধীজি চিরকালের গান্ধীজি হ'য়ে রয়ে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি অনুভব করতে লাগলাম যে তাকে ভালবাসি, শুধু ভালবাসিই না, মা, বাবা, আমার যেখানে যত প্রিয়জন আছে তাঁদের সকলের চেয়ে এই নামটি আমার বেশী প্রিয়। তাঁর নাম ক'রে কিছু করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার মত ছোট্ট ছেলেরা তাঁর কাজে লাগবে না, এ কথা ভেবে আমি ভারী

বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। কিন্তু এই ভুল আমার শীঘ্রই ভেঙ্গে গেল। সকলকে এমন কি আমাকে দিয়েও যে তাঁর দরকার থাকতে পারে শীঘ্রই এ কথা প্রমাণিত হ'ল।

ভবিষ্যতে অসহযোগ আন্দোলনকে চালাবার বিশেষ অবলম্বন ছিল রাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, আর অপরটি ছিল খিলাফৎ প্রশ্ন। যুদ্ধের মধ্যে (১৯১৪-১৮ সালে) ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধের মধ্যে যাই হোক, যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে খলিফাকে তাঁর পুরাতন তক্তে বসান হবে তাঁর পূর্ব ক্ষমতা দিয়ে, তাঁর সমস্ত দেশও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ভারতীয় মুসলমানেরা এই আশ্বাসেই লড়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হ'তে লাগলো। মুসলমানদের দাবী ছিল সমস্ত আরব দেশ, তার সঙ্গে থ্রেস ও এশিয়া মাইনর সমেত সমস্ত পুণ্যস্থানগুলি খলিফার অধিকারে রাখা হোক্। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুধু তো এই একটি জায়গায় নয়, বহু জায়গাতেই বাক্যদত্ত ছিলেন। তাই গ্রীসকে থ্রেস দিয়ে দেওয়া হ'ল। আরবকে ভাগ করা হ'ল ইংরেজ, ফ্রান্স, আর আরবদেশীয় কুইস্লিংদের মধ্যে, যেই কুইস্লিং সম্প্রদায় অটোমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল ভিতর থেকে—তাদের মধ্যে। ইংরেজের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় মুসলমানরা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। তারা গভীর অসন্তোষের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। গান্ধীজি এই সুযোগ গ্রহণ করলেন আর শীঘ্রই তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের এক বিশিষ্ট সমর্থকরূপে পরিচিত হ'লেন। এই সময় থেকেই মুসলমানদের এক বিশিষ্ট নেতারূপেও তিনি পরিগণিত হ'লেন।

খিলাফৎদের দাবী মেনে নেওয়ায় অনেক বুদ্ধিজীবী মুসলমানকে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে টেনে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল সত্য কিন্তু ধর্মানুরাগকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনারও বিপদ আছে। সেই সময়ে সব চেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনৈতিকেরাও এর ফলাফল বুঝতে পারেন নি। আজ বহু বৎসর পরে আমরা সে ঘটনাগুলির ঠিক বিচার করতে পারি, আর ঐ সব ঘটনার গোড়ায় যে কি শক্তি কাজ করছিল সেটার নির্ণয় করাও আজ সহজ

হয়েছে। রাজনীতি আর ধর্মকে এইভাবে মিশিয়ে ফেলা ভুল সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের ঐ অবস্থায় এটা যে অনিবার্য ছিল এটা যদি স্বীকার না করি তাহলেও আমাদের ব্যাখ্যায় ভুল হবে, তাতেও কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপদ দেশের তুলনায় গান্ধীজী অবশ্য সমস্ত ঘটনাগুলিকে রাজনীতির সূত্র অনুসারেই বিচার করে থাকেন, কিন্তু কোন সমস্যাতেই তিনি ধর্মসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা না ঢুকিয়ে তাকে রূপ দিতে পারেন না। সমস্ত সমস্যাকেই তিনি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সমীকরণের সমস্যায় ফেলবেনই ফেলবেন। রাজনীতিক গান্ধীজীর জন্মের বহু পূর্ব থেকেই রাশিয়ার আর অন্য রাজনৈতিক বন্দীরা উপবাসকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বুখারিণের মত মানতে হলে বুঝা যাবে যে তাঁরা উপবাস করতেন শ্রেণী-সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলবার জন্য। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে উপবাস হল হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সমীকরণের উপায় বিশেষ। এইভাবে গান্ধীজী সব সময়েই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন। কোনও রাজনৈতিক নেতাই প্রচার-কার্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। গান্ধীজীও করেন না। কিন্তু তাঁর প্রচার-কার্যের উপর থাকে ধর্মের সত্য-সৌন্দর্য। "ভারতবর্ষ, ১৯২০" গবর্ণমেণ্টের এই বার্ষিক রিপোর্ট-টিতেও ঠিক এই কথাই আছে,—"গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক আত্মশক্তির প্রচার, তাঁর আত্মত্যাগে বিশ্বাস আর সন্ন্যাস, মুগ্ধ জনসাধারণের কাছেই মূল্যবান্।"

১৯২০ সাল। ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাগুলোকে রাজদরবারে উপস্থাপিত করবার জন্য মুসলমান জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিগোষ্ঠী মার্চ মাসের প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন মহম্মদ আলী। প্রথমে একজন নিম্নপর্যায়ের অধস্তন সেক্রেটারী এদের আহ্বান করলেন পরে অবশ্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসেও এঁদের যথোপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়েও এই সব নেতাদের প্রতিনিধি-প্রেরণে আর সাম্রাজ্যের বড় বড় কর্মচারী আর মন্ত্রীদের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

মহাযুদ্ধ তখন বছর দুই হ'ল, শেষ হয়েছে। সুতরাং বৃটিশের আর কারুর

সাহায্যেরই তখন প্রয়োজন ছিল না, না হিন্দু না মুসলমানের। কাজেই প্রধান মন্ত্রীর তখন রাজনৈতিক কোন ছলাকলা আশ্রয়ের দরকার আর হ'ল না। পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে খৃস্টান দেশগুলির ওপর যে নীতি চালু হয়েছে,তুরস্কের ওপরও সেই নীতি প্রযুক্ত হবে—তার চেয়ে উন্নততম কোন নীতি চালু হবে না। অর্থাৎ জার্মানী আর অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে যখন খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে, তখন তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্যও মুসলমানদের অনুযোগ করা উচিত হবে না। বক্তৃতাটি খুবই পরিষ্কার আর যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে এই, যে যুদ্ধ যখন চলছিল তখন কেন মিঃ লয়েড জর্জ এই কথাগুলি বলেননি? যদি দেবার মত কিছুই ছিল না তবে কেন তিনি আশার উদ্রেক করেছিলেন মিথ্যার জাল বুনানিতে? এর উত্তরটা খুব কঠিন নয়। তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধের জন্য মুসলমান সৈন্যের দরকার ছিল, আজ তো আর তার প্রয়োজন নেই। এখন এটা বোঝা খুবই সহজ কিন্তু মুসলমানদের এইসব নেতারা যুদ্ধের মধ্যেই বৃটিশের এই চালটা কেন ধরতে পারলেন না? লয়েড জর্জ ১৯১৭ সালে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কেন করে ছিলেন সেটা বোঝা তো কঠিন নয়, কিন্তু ভারতীয় নেতারা কেন যে এই প্রতিজ্ঞার স্বরূপ বুঝতে পারেননি!

গান্ধীজী মুসলমানদের এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করায় আরও দুর্ভাগ্যের সূচনা হ'ল। কেননা, এতে গান্ধীজীর স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতা আরও বেশী নৈতিক বলপ্রাপ্ত হ'ল আর তার প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হলো। শেষ অবধি তাই আরও বেশী গোলযোগের সৃষ্টি করে আন্দোলনটির গলা টিপে মারা হ'ল। খিলাফৎ আন্দোলনের মৃত্যুর পরই যে মুসলমানরা কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে এল, তার মধ্যে আকস্মিকতার কিছুই ছিল না। এইখান থেকেই ভুলের ফসল সুরু হ'ল।

১৯শে মার্চ তাই দেশব্যাপী উপবাস, প্রার্থনা আর হরতাল পালন স্থির হ'ল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতাল পালন করার পর থেকে এটাকে প্রায়ই প্রতিবাদ জানাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। প্রথম হরতালের কথা আজও আমার মনে পড়ে। হরতালের দিন রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম যে দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তায় লোক

চলাচল খুবই কম। ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, ছ্যাকড়া গাড়ীগুলোর শব্দও শোনা যায় না, কোন যানবাহনের পাত্তা নেই। উত্তর ভারতের চির প্রসিদ্ধ দু'চাকার এক্কাও অন্তর্হিত। পায়ে-চলা লোকেরও ভিড় নেই রাস্তায়। আমার মত হরতাল দেখতে দু'চারজন রাস্তায় বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা কোথাও ভিড় করেনি। তারা যেন হরতাল ভঙ্গ করেছে এরকম লজ্জিত আর ত্রস্তভাবে রাস্তা দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। আমিও আর বেশীদূর না গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। কেননা হরতাল ভঙ্গকারী হতে আমি চাইনি। আমার মনে হয় সকলে এরকমই ভাবছিলেন। এই হরতালগুলি সারা ভারতের একত্ববোধের দ্যোতক ছিল। এর আগে কেন এর পরেও ভারতে এমন হরতাল বড একটা দেখা যায়নি।

পরবর্তীকালে এই হরতালের মধ্য দিয়েই প্রথম অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ভারত রাজনৈতিক চেতনায় একটু একটু করে জেগে উঠেছিল।

এই সময়ে গান্ধীজী নবীনতর শক্তি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আন্দোলনমঞ্চে প্রবেশ করলেন। বল্লেন তিনি, যদি তুরস্কের সঙ্গে সন্ধির সর্তগুলি মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনক না হয়, তবে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবেন। এইখানেই গান্ধীজীর মহত্ত্ব। যখন কেউ কোন পথ বাৎলাতে পারলেন না, চতুর্দিকে হতাশা আর অসহায়তা, তখন গান্ধীজীই পথ দেখালেন।

মুসলমান প্রতিনিধিরা বিলাতে সফল হলেন না। তাঁরা ইউরোপেই রয়ে গেলেন। কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। ব্যাপারটাকে মিটোবার বদলে এটা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ার সামিল হ'ল। সন্ধির সর্তগুলি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টটি বার হ'ল। একই সঙ্গে দুই বজ্রপাতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আগুন জ্বলে উঠলো। বারুদের স্তূপে আগুনের কণা পড়ল। যেমন মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে যায় এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হ'ল।

২রা জুন এলাহাবাদে সর্বদলীয় নেতাদের একটি মিটিং হল এবং তাতে ঠিক হ'ল অসহযোগ আরম্ভ করা হবে। অসহযোগের প্রোগ্রাম ঠিক করবার জন্যে একটি কমিটিও গঠিত হ'ল।

মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় পন্থা ছিল 'হিজরৎ'। কিন্তু গান্ধীজীর

অসহযোগ-এর কাছে এই পলায়নী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রোগ্রামটির কোনই আকর্ষণ রইলো না। অবশ্য কোন মুসলমান বড় নেতাই হিজরৎ গ্রহণ করেন নি। ঠিক এই সময়ে ঘোষণা করা হলো যে মহামান্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ভারতবর্ষ দর্শন করতে আসবেন। ভ্রমণটার কারণ ভারতের অশান্ত অবস্থায় শান্তি আনার প্রচেষ্টা ; তাঁদের এ ভুল ভাঙতেও অবশ্য বিশেষ দেরী হয়নি।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত কোলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। গান্ধীজী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, দুইটি প্রধান অভিযোগের জন্যে অসহযোগ আন্দোলন দরকার ছিল। তাঁদের আলোচনার পর প্রস্তাবে বলা হ'ল "কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে এই দুইটি অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দেশের অবস্থা শান্ত হতে পারে না। জাতীয় সম্মান রক্ষা আর ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যাতে হতে না পারে তার জন্যে দরকার স্বরাজের। এই ভুল দুটির সংশোধন আর স্বরাজ স্থাপন করতে হলে ভারতবাসীর শাসনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই যে একমাত্র উপায় যে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ কংগ্রেসের নেই।"

সে সময়ে আমি বিদ্রোহ বা তার সংশোধিত মতামতগুলির বিষয় কিছুই জানতাম না। কিন্তু শুনলাম যে আমার মত শিশুরাও এই আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয়। আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন তাই এই কংগ্রেসের প্রস্তাব তাঁর পক্ষেও প্রযুক্ত ছিল। যদি ছাত্ররাই চলে যায় তবে আর শিক্ষকদের কি করবার রইলো? তাঁদেরও আর স্কুল ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। আমার ভাই মনোমোহন আর আমার পক্ষে স্কুল ছাড়াটা যদিও একটি আনন্দের বিষয় ছিল, কিন্তু আমার বাবার পক্ষে ব্যাপারটি এত সহজ ছিল না। কেননা, ঐ চাকরিটিই বাবার জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। তাঁর ব্যাঙ্কে কোনো টাকা জমা ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি স্কুলের সঙ্গে অসহযোগ আরম্ভ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর ক্ষমতানুয়ায়ী সামান্য কিছু করতেও তিনি প্রস্তুত

ছিলেন। আমার লোকান্তরিত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের জন্যে আমি আজ এসব কথার পুনরুল্লেখ করছি না, করছি এই সত্য দেখাতে যে জাতীয় আন্দোলনের গোড়ায় এরকম অনেক নীরব আত্মত্যাগের স্মরণীয় কাহিনী আছে প্রচ্ছন্ন।

বাবা যে পথ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সে পথের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি তাঁর পথ থেকে বিচলিত হননি। মা এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। তাঁর সঙ্গে এসব বিষয়ে কোনোদিন কেউ পরামর্শও করতেন না। আমার মনে হয় এসব বিষয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না। তাঁর শিক্ষাই ছিল এ রকম। এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর একটি অতি সাধারণ মেয়ে। ঠাকুরমা চতুর্দিকে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তা' দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিলেন, এমন কি ফলাফল সম্বন্ধেও তাঁর কিছু অজানা ছিল না। কিন্তু বাবাকে তিনি নিরুৎসাহ করেন নি। জীবনে বহু দুঃখকষ্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই অজানা একটা কিছুকে গ্রহণ করতে তিনি ভয় পান নি। তিনি জানতেন যে প্রথম ধাক্কা যতই কঠিন হোক দিন তারপরে চলে যাবেই, তার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। বিপদের দিনে তার ঔদাসীন্য আর বহু বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে দুঃসাহসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল, আমার মনে হয়, তার সাহায্য না পেলে বাবার পক্ষে এই ভীষণ বিপদপূর্ণ পথে পা বাড়ান সম্ভবপর ছিল না। একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হয়ে, যিনি চিরজীবন ভাড়াবাড়ীতে বাস করে এসেছেন, যিনি যুদ্ধারম্ভের পাঁচছয়মাস অনশনের আশঙ্কা করে কোনরকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন, তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের আহ্বানে কাজে ইস্তফা দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এতে কোনো ভুল নেই।

২রা অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দুইটি অর্থভাণ্ডার খোলার স্থির করলেন। (ক) প্রথমটি হ'ল তিলক স্মৃতিভাণ্ডার আর (খ) দ্বিতীয়টি হ'ল স্বরাজ্য অর্থভাণ্ডার। এই ব্যাপারে আমি আবার বুঝতে পারলাম যে ছোটদের দিয়েও কিছু কাজ হতে পারে। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাসেবকদের একটি করে তালা দেওয়া বাক্স দিলেন। তার মধ্যে একটি করে ছোট গর্ত

ছিল। দাতারা টাকাপয়সা তার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ফেলে দিতেন। স্বেচ্ছাসেবকরা এইরকম বাক্স নিয়ে রাস্তা আর গলির প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে পথিকদের অনুরোধ করবেন পয়সার জন্যে। এখানে আমার প্রয়োজন ছিল।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের পরই নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। কলিকাতায় যার সূচনা হয়েছিল, নাগপুরে তার পূর্ণ সমাপ্তি হ'ল, এতে একটা নোতুন যুগের সূচনা হ'ল। এইখানেই দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা ঘোষণা করা হ'ল। হৃদয়-অন্বেষণের যুগ শেষ হ'ল, সহযোগ আর অসহযোগের চুলচেরা বিভিন্নতা ব্যাখ্যারও শেষ হ'ল। কংগ্রেসের নেতারা এবার সমস্ত বাধা কাটিয়ে মনস্থির করেছিলেন। আসল কথা ঘটনাস্রোতের বিবর্তনে এছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো পথই খোলা ছিল না।

জানুয়ারীর প্রথমেই বেনারসের স্কুলকলেজ-ছাড়া আন্দোলনটা বেশ জোরালো হয়ে উঠলো, অবশ্য আমার মনে হয় ফেব্রুয়ারীর আগে এটা বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি। প্রথমে বিরাট ছাত্র-মিছিল বেরুতো শ্লোগান দিতে দিতে। জনপূর্ণ রাস্তাই এই মিছিল বেরুবার জন্যে ঠিক হ'ত। যা হোক, ছাত্রদের মিছিল আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা হযে উঠলো। শিক্ষক আর অভিভাবকরা যাঁরা আন্দোলনের এই অংশটির বিরোধিতা করতেন তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। এই আন্দোলনে আমাদের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো, কয়েকটা নোতুন বিষয় আমাদের চোখে পড়ল।

আমরা ছেলেমানুষ হলেও এই সময় থেকে স্বদেশের কাজে, আন্দোলনের কাজে, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে লেগে গেলাম। অবশ্য আমরা সভ্য খুব অল্প সংখ্যাতেই করিয়েছিলাম। কিন্তু লোকদের বহু বড় বড় বিষয়ে ভাবতে সুরু করতে সাহায্য করেছিলাম। আমরা তাঁদের মনে আশার উদ্রেক করেছিলাম। এটাও খুব কম কথা নয়। ভারতের গ্রামের চাষীরা তখনও সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অতি নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছিল। শুধু তার জমিটুকুই ছিল তার জীবন। কিন্তু কংগ্রেসের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে বৃহৎ পৃথিবীর স্বাদ পেতে আরম্ভ করলো।

নিজেদের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙে তারা বৃহত্তরের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। এইটাই হলো গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় বিজয়। মত ও পথের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও কেউ গান্ধীজীর এই মহৎ দিকটা চাপা দিতে পারবে না।

আমেথী একটি সাবডিভিসনাল সহর। কাজেই আসল গ্রামে আমরা তখনও যাইনি। আমেথাতে একটু কাজ আরম্ভ হলেই আমাদের ওপর গণ্ডগ্রামগুলোতে যাবার নির্দেশ ছিল। কাজেই এক সপ্তাহ পরে আমরা গাঁয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এতদিন অবধি আমাদের গতি ছিল বাধা মুক্ত, এইবারেই আসল সঙ্কট উপস্থিত হল। যে ভারতবর্ষ সহরের সমস্ত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও নির্বিকার, সেই আসল গ্রাম্য ভারতবর্ষে আমরা এতদিনে প্রবেশ করলাম। এখানেই বিরোধিতা প্রবল ছিল। এখানে সাক্ষাৎভাবে পুলিশে নয়, পুলিশের আগমনে যে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তারাই আমাদের বিপক্ষাচরণ করতে লাগলো।

সর্বশক্তিমান সরকার বাহাদুর পুলিশ আর মোড়লদের মারফৎ এই গ্রামবাসিদের খবর দিয়েছিল যে আমাদের সঙ্গে মিশলে ভীষণ বিপদ হবে। আর তারাও এটাকে ধ্রুবসত্য বলে ভেবে নিয়েছিল। এ সময়টা ছিল গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি। দশটা থেকে "লু" বইতে আরম্ভ করতো। কাশীতেও অবশ্য "লু" চলতো তবে পাঁচিলে ঘেরা সহরের মধ্যে থেকে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে সেটা কত ভয়ানক। আমরা গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে যেতাম। যাতায়াতের বন্দোবস্ত যে ছিল না, তা' নয়। ঘোড়া, গোরুগাড়ী বা উটের গাড়ী সবই ছিল, কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনোটাই সহজলভ্য ছিল না। কোনো কোনো সময়ে বিশ মাইল কি তার চেয়েও বেশী আমাদের হাঁটতে হ'ত। গড়পড়তা দৈনিক প্রায় ১৫ মাইল আমাদের হাঁটতে হ'ত। কিন্তু গ্রামবাসিরা যদি আমাদের প্রতি একটু সদয় হতেন কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করতাম না।

কোনো কোনো গ্রামে অভ্যর্থনা হতো এইভাবে: গ্রামের সীমান্তে এলেই হয় চৌকীদার, নয় মোড়ল, না হয় যে কেউ পদস্থ ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে বিনীত ভাষায় আমাদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধ করতেন। সত্যি তখন

ভারী বিশ্রী লাগতো। আমরা তাদের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাতাম যে, যে কেউই ইচ্ছে করলে গ্রামে ঢুকতে পারে। তারা তর্ক করতো না, শুধু চুপ করে সব শুনে উত্তর করতো যে তাদের বলা হয়েছে যে, আমরা ঢুকলে তাদের বিপদ হবে। যদি মোড়ল একটু বুদ্ধিমান বা সহানুভূতিশীল হ'ত তবে আমাদের ডেকে নিয়ে নীচু গলায় বলতো, সে গান্ধীজীর নাম শুনেছে, তাঁর প্রতি তাঁর আড়ালে সহানুভূতি আছে, কিন্তু গ্রামের মোড়ল হিসাবে বাধ্য হয়েই তাকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে। আমরা চুপ করে তার কথা শুনতাম, তারপর আমাদের উদ্দেশ্য, গান্ধীজীর কংগ্রেস, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ড, খিলাফৎদিগের উপর অন্যায়, এসব বিষয়ে বক্তৃতা করতে করতে আমরা গাঁয়ে ঢুকতাম। এইসব সরল লোকগুলি ওপর ওপরই পুলিশের ভয়ে আমাদের তাড়াতে চাইতো, নয়তো মনে মনে আমাদের সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। তারা আমাদের সঙ্গে মিশে আমরা সত্যিই খারাপ লোক কিনা সেটা যাচাই করে নিতে চাইতো।

বেনারসে ফিরে কি অবস্থায় যে আমি পালিয়ে এসেছি বাবাকে সব খুলে বল্লাম। সমস্ত অবস্থাটা তিনিও ভালো করেই বুঝলেন কিন্তু আমার কাজের সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন না, শুধু চুপ করে রইলেন। মা আর ঠাকুরমা আমাকে দেখে আর আমি যে সুস্থদেহে নিরাপদে ফিরে এসেছি তাই দেখে খুব খুশী হলেন। আমাকে তারা একটি ছোটখাট বীর বলে ভাবতে লাগলেন, আর অন্যান্য স্ত্রীলোকের কাছেও আমাকে সেইভাবে পরিচিত করতে লাগলেন।

একদিন, বোধ হয় ফেরবার তৃতীয় দিন, আমি বাবাকে বল্লাম যে আমি আমার কাজে ফিরে যেতে যাই। তিনি তৎক্ষনাৎ সুলতানপুরে গান্ধী-আশ্রমে চিঠি লিখলেন। দুই দিনের মধ্যে তার উত্তর এলো আর আমিও কাজে ফিরে গেলাম। অবশ্য এ সময় দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়েই আমি যাত্রা করলাম। আমি একটা পদে প্রতিষ্ঠিত হলাম আর যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করতে লাগলাম। এটা যেন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, আমি রাজনৈতিক কর্মী হবার মনস্থ করলাম, এ সময়ে গ্রামের রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে হাজারো অসুবিধা,

কষ্ট বা ইঙ্গভারতীয় পুলিশ বা নির্দয় আবহওয়া কেউই আমাকে দমাতে পারে নি। দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে আমি আমার কাজ করে চল্লাম।

আমরা যখন সুলতানপুরে ভারতের গ্রামগুলিতে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করছিলাম সে সময় ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাগুলির দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছিল। ঘটনা বিশেষ সঙ্কট অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ৮ই জুলাই ভারতে খিলাফৎ বৈঠক বসলো। সভাপতি একটি তেজগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতাটি পরে তাঁর ও তাঁর যোদ্ধাভ্রাতার কার্যপ্রণালী হ'য়ে দাঁড়াল। এই বৈঠকে বলা হ'ল "যে কোনো বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে সেদিন থেকে সৈন্য দলে যোগ দেওয়া বা সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করা হবে বেআইনী।" বৃটিশ সিংহের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। শান্তমূর্তি ত্যাগ করে আসলমূর্তিতে এবার সে প্রকাশিত হ'ল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারে দেশময় চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর পর আলী ভ্রাতৃদ্বয়ই ছিলেন ভারতের সবচেয়ে প্রিয়তম ব্যক্তি। সে সময়ে তাঁরা দেশের এত প্রিয় ছিলেন যে পরের যুগে মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র কেউই বোধ হয় তাদের মতো জনপ্রিয হতে পারেন নি। অবশ্য এই জনপ্রিয়তা স্থায়ী হয় নি। তবে সে হ'ল একটা আলাদা অধ্যায়। এ সময়ে তাঁরা গান্ধীজির মতোই লোকপ্রিয় ছিলেন।

কাজেই তাঁদের গ্রেপ্তারে দেশে বিরাট চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এটাই অবশ্য দেশে প্রথম গ্রেপ্তার নয়। তবে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারে সমস্ত আন্দোলনটাকে আঘাত দেওয়ায় ব্যাপারটা একটু গুরুতর হযেই দাঁড়ালো। গবর্ণমেণ্ট যখন সোজাসুজিভাবে আমাদের শক্তির প্রতি বিরোধের আহ্বান জানালেন, তখন কংগ্রেসের ওপরওয়ালারা হুকুম দিলেন ১৬ই অক্টোবরের মধ্যে যতগুলো সভায় সম্ভব ঐ বক্তৃতাটি পাঠ করতে হবে। এইভাবে গ্রেপ্তারটি জনমত গঠনে বিশেষ সাহায্য করলো। কার্যনির্বাহক সমিতি আহ্বান করা হ'ল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁরা এই প্রস্তাব পাশ করলেন।

তখন এই প্রস্তাবটি পাঠ করে মনে হয়েছিল যেন বড়ই শান্ত এটা। ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে স্বরাজ আনবার আশ্বাস আর সেই সঙ্গে সৈন্যদের কাজ-ছাড়বার আহ্বানে ইতস্ততঃ করার একমাত্র অর্থ ছিলো এই যে গবর্ণমেণ্টের ওপর কংগ্রেস সত্যকার চাপ দিতে চায়নি। তা' ছাড়া জগতের ইতিহাস ঘাঁটলেও এমন নজীর দেখা যাবে না যে প্রথমে বিদ্রোহী সৈন্যদল আর সরকারী চাকুরেদের খাবার বন্দোবস্ত ক'রে তারপর রাস্তায় নামবার আহ্বান জানান হয়েছে। যে বিদ্রোহ নিজের ওপর নিজে দাঁড়াতে পারে না সেটা বিদ্রোহই নয়। আরও দেখি অসহযোগকারী সৈন্য আর পুলিশদের জন্যে এই প্রস্তাবটি স্থতাকাটা আর তাঁতবোনার ব্যবস্থা করেছিল। যে উত্তেজনায় সৈন্যদের আনলে পরিণামে ভয়হীন অন্ধকারে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেই উত্তেজনায়-ও সৈন্যদের আনা হয়নি। এই সময় থেকে কার্য-নির্বাহক সমিতি স্থতাকাটার ওপরই বেশী নজর দিতে আরম্ভ করেছিল। একটা অবশিষ্ট তালিকা মাত্র থেকে এটা চট্ ক'রে একেবারে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল। চরখা এই সময় থেকেই সর্বত্র অনধিকার প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো। এই সময়ে কার্যনির্বাহক সমিতি বলেছিল যে বিদেশীবস্ত্র-বর্জন আন্দোলন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আর এটা না হলে আইনঅমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা সম্ভব নয়। আর জেলায় বা প্রদেশে স্থতোকাটা আর তাঁতবোনা যথেষ্ট পরিমাণে না আরম্ভ হলে আইনঅমান্য আন্দোলনের আদেশ হবে না।

কার্যনির্বাহক সমিতি এইভাবে ক্রমশই গান্ধীপন্থী হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। যাই হোক এই ব্যাপারে কংগ্রেস যুবরাজের আগমন-উৎসবকে :বর্জন করে দেশকে জাগাতে চাইলো। বেনারসে আমরাও যুবরাজের আগমন-উৎসবকে বর্জন করাটা যাতে সফল হয় তার আয়োজন করতে আরম্ভ করলাম। বেনারস অতি পুরাতন সহর, (ঋক্‌বেদের সময়ে না হোক বুদ্ধ এখানের মৃগদাব থেকেই ধর্মপ্রচার করেন) তাই এখানে যুবরাজ আসার আয়োজন হ'তে লাগলো। আমরা তাকে বর্জন করলেও সহরের রাজা মহারাজা বা সরকারী চাকুরেরা যুবরাজকে রাজসিক অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজনে মত্ত হয়ে উঠলো। প্রায় আটটা অঙ্কের একটা অর্থ এই জন্যে ব্যয়িত হবার ব্যবস্থা হ'ল।

১৭ই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাই-এ অবতরণ করলেন। সেই দিনই বোম্বাই-এ এ দাঙ্গা আরম্ভ হ'ল। আর সেটার জের চল্লো চারদিন ধরে।

গান্ধীজি, যাঁর ওপর দেশবাসীর বিশ্বাসের অন্ত নেই; সবচেয়ে যিনি বিশ্বাসী আর প্রিয়,যিনি দেশকে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে স্বরাজ আনবার নিশ্চয়তা দান করেছেন, প্রথম জনবিক্ষোভকে তিনি এইভাবেই গ্রহণ করলেন। এই প্রথম জনবিক্ষোভকে যদি তিনি অনশন করে থামাবার চেষ্টা না করতেন তবে তার সম্ভাবনা যে কত বিরাট ছিল সে কথা ভারতে পারা যায় না। যখন শত্রুর চেয়ে দেশ দুর্বল তখন হিংসাকে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলতে যে হবে তাতে ভুল নেই। কিন্তু তাই বলে অহিংসায় সকল আস্থাস্থাপনে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অহিংসা ভিন্ন সকল প্রকার পন্থার প্রবেশ নিষেধ করাটা আমাদের ভালো লাগে নি। আমাদের মনে হয়েছিল এ-অবস্থায় লেনিন নিশ্চয়ই আলাদা ব্যবহার করতেন। প্রথম বিপ্লবের অঙ্কুরকে অনশনের দ্বারা দেখাতে না চেয়ে তিনি নিশ্চয়ই তাকে অভিবাদন করে তাকে প্রয়োজনীয় খাতে চালনা করতেন। আর তা'হলে এই বিপ্লবের অঙ্কুর দাঙ্গা আর রক্তপাতের অনুর্বর ক্ষেত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই নিঃশেষ হতো না।

বোম্বাই এর দাঙ্গা আর নেতার অনশন সংবাদ যথাসময়ে কাশীতে পৌঁছল। (এ সময়ে আমি নিয়মিত কাগজ পাঠ করতাম) এর ফলটা অবশ্য বিশেষ সুবিধাজনক হ'ল না। গুরুজনে কানমলে দিলে যেমন অবস্থা হয় কংগ্রেস কর্মীদের অবস্থাও সেই কানমলা-খাওয়া বালকদের মতো হ'ল। তাঁদের ভয় হ'ল যে শেষ অবধি হয়তো গান্ধীজী যুবরাজের আগমন-উৎসব বর্জন করার প্রোগ্রামও ত্যাগ করবেন। এ আশঙ্কা অবিশ্যি শীঘ্রই দূর হলো, আর যুবরাজের অভ্যর্থনা-বর্জনের আয়োজন আবার চলতে লাগলো। নেতার অনশনে অবশ্য সব কংগ্রেসকর্মীর মনেই অল্প বিস্তর দাগ রেখে গেল। বোম্বাই-এর দাঙ্গা আর নেতার অনশন যদিও কেউ এমন কি বামপন্থীরাও বিশেষ লক্ষ্য করেন নি কিন্তু এটাই ১৯২১ সালের আন্দোলনের এমন কি তার পরবর্তী আন্দোলনগুলিরও মোড় ফিরিয়ে দিল। তাঁরা ঠিক করলেন যে গান্ধীজীর

উদ্দেশ্য যখন অধিকার নয়, তখন একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে স্বরাজ না এলে একমাত্র Pressure politicsএর অনুসরণ করা, যার একমাত্র কর্মসূচী হলো জেলে যাওয়া। রাউলাট বিলের বিরোধিতা আর গান্ধীজীর বোম্বাই অনশনের মধ্যবর্তী সময়ে দেশ নিজেই নিজের নেতা ছিল। অবশ্য প্রতিদিনই গান্ধীজীর প্রভাব হু-হু করে বেড়েই চলছিল। বোম্বাই অনশনই এমন যুগের আরম্ভ করলো যে যুগে গান্ধীজীই হলেন অবিসম্বাদী নেতা, যাঁর হুকুমে আন্দোলন আরম্ভ বা ভাঙা বা আদপে হবেই কিনা সেটা নির্ভর করবে। যুবরাজ-বর্জনের প্রস্তাবকে সফল করবার জন্যে সমস্ত দেশে স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করা হচ্ছিল। এই সময় যুবরাজের আগমন-উৎসবকে বর্জন করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে আমি ধরা পড়ি। সেই গল্প বলছি।

ইস্তাহারগুলি আমাদের হাতে এলো, আর কাকে কোনদিকে যেতে হ'বে তার নির্দেশও দিয়ে দেওয়া হ'ল। আগে থেকেই রাস্তাঘাট সব ঠিক্ করা ছিল, কাজেই কাজ ভাগ করে দেওয়াতে বিশেষ দেরী হ'ল না। উপদেশগুলির আমরা অর্ধেক বুঝলাম, অর্ধেক বুঝলাম না। অবশ্য ইস্তাহারগুলি যখন একেবারে হাতে এসে পড়েছে, তখন আর তোযাক্কা কিসের?

১১ই নভেম্বর, একমাস আগে আমার মা অতি শোচনীয়ভাবে মারা গেলেন। সেদিন আমাদের খাবার পর তিনি খাবার জায়গায় মাটী লেপছিলেন। এটা তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল। প্রায় প্রতি বাড়ীর গৃহিনীই এ কাজটা করে থাকেন। চিম্‌নিহীন কুপীর আলোতে তিনি কাজ করছিলেন। আমাদের একটা মাত্র লণ্ঠন ছিল, আমাদের পড়ার জন্যে সেটা রাখা হ'ত। অবশ্য এটায় আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী হত। কাজ করতে করতেই তিনি হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হলেন, আর তার শাড়ীতে আগুন ধরে গেল। বাবা আর আমরা দোতলায় পড়াশুনা করছিলাম, কাজেই মা যে একতলায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রইলেন তার খবর আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। ঠাকুর-মাও সে সময়ে শুয়ে পড়েছিলেন, মায়ের ওপরে আসাতে অস্বাভাবিক দেরী

হওয়ায় বাবা দেখতে গেলেন যে ব্যাপারটা কি, তখনই ব্যাপারটা জানা গেল। আমরা দৌড়ে ওপর থেকে নেমে এলাম, ঠাকুরমাও উঠে এলেন, ডাক্তার ডাকা হ'ল। মা ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মুখটা এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে তাঁকে আর চেনাই যায় না। তিনি এরপর মাত্র আর এগার দিন বেঁচেছিলেন, তারপর মারা যান। সংসারের দারিদ্র্যের জন্য মায়ের ভালোভাবে চিকিৎসাও হয়নি। অলিভঅয়েলের বিষয় নিয়ে বাবা আর মারওয়ারী ডাক্তারখানার ডাক্তারের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল আমার তা আজও মনে পড়ে। বাবার অলিভঅয়েল কেনবার টাকা ছিল না। অলিভ-অয়েলটা দামীও ছিল আর প্রয়োজনও ছিল অনেকটার, কিন্তু ডাক্তার এই ওষুধটার জন্যেই জোর করেছিলেন। এ বিষয় নিয়ে দুঃখ করবার কিছুই নেই। আমাদের এই বিরাট দেশে হাজার হাজার লোক জন্মভোর অন্ধ হয়েই দিন কাটাচ্ছে, উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে এরকম আরও যে কত ঘটনা ঘটছে তার ঠিক নেই। এ সময় অবধি দারিদ্র্যের জ্বালা যে কি তা আমি সঠিক জানতাম না। আমি এই অবস্থাতেই জন্মেছিলাম, তাই সবটাই স্বাভাবিক বলেই বোধ হ'ত। কিন্তু এই অলিভঅয়েলের ব্যাপারটায় আমি প্রথম দারিদ্র্যের জ্বালা বুঝতে পারলাম। যেদিন রাত্রে আমার মা মারা গেলেন সেই রাত্রে বাবা কপর্দকহীন। যদি ঠাকুরমা সাহায্য না করতেন তবে মায়ের মৃতদেহের যে কী গতি হ'ত তা' আমি ভাবতেই পারি না।

ইস্তাহারের বাণ্ডিল নিয়ে যখন ফিরছিলাম তখন বাড়ী যাবার জন্যে আমি লালায়িত হই নি। তবুও অজান্তে আমি বাড়ীর দিকেই গেলাম। বাড়ীতে ঠাকুরমা ছাড়া অবশ্য আর কেউ ছিলেন না। তাঁকে বলবার আমার কিছুই ছিল না। বাড়ী থেকে সোজা চলে গেলাম। গোধুলিয়া থেকে দশাশ্বমেধ-ঘাট অবধি যে রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তায় আমাদের ইস্তাহার ছড়াতে বলা হয়েছিল। আমি চারিদিকে ইস্তাহার ছড়াতে ছড়াতে এগুতে লাগলাম। ইস্তাহার ছড়াবার কাজে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে ইস্তাহারটা পড়েও দেখিনি। যখন ছড়াচ্ছিলাম তখন প্রতিমুহূর্তেই অদ্ভুত একটা কিছু ঘটবার

আশা করছিলাম, কিন্তু কিছুই ঘটলো না। লোকেরা ইস্তাহারগুলি নিল বটে, কিন্তু তাতে তারা বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল এমন মনে হ'ল না। তারা এমন ভাব দেখাতে লাগলো—যেন কোনো ওষুধের বিজ্ঞাপন এসেছে। আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। তাই কয়েকটী লোককে ডেকে আমি বল্লাম যে আমার কাগজগুলি ঠিক্ ঐ রকমের নয়।···রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে আমি নিরাপদেই ইস্তাহারগুলি বিলি করলাম। কিন্তু কিছুই ঘট্‌লো না। আমার ইস্তাহারগুলি সব ফুরিয়ে গেল এমন কি আমার নিজের জন্যেও একটী রইলো না। যদিও কেউ আমাকে বিশেষ লক্ষ্য করছিল না, তবু নিজেকে আমার কেউ-কেটা বলেই মনে হলো। দুপুরটায় করবার কিছুই ছিল না, তা ছাড়া জানতামও না যে এরপর কি করতে হবে, তাই আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, কেউ আমার ইস্তাহার পড়ছে কিনা। আমি কযেকজন লোককে ইস্তাহার পড়তে দেখে আর তাদের চারিপাশে ছোটখাট একটী জনতা গড়ে উঠতে দেখে খুশী হলাম। আমিই যে এই গুঞ্জনের সৃষ্টিকর্তা একথা ভেবে খুব গর্ব অনুভব করতে লাগলাম। ইস্তাহারের সংখ্যাল্পতার জন্যে আমার দুঃখ হ'তে লাগলো। অবশ্য আমি সান্ত্বনা পেলাম খানিকটা এই ভেবে যে, এই সংখ্যাল্পতার জন্যই এটা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সহজেই, তা'ছাড়া সময়টাও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, তাই, সামান্য চেস্টাতেই কাজ হ'ল।

এই সময়ে ব্যাপারটা কি জানতে পুলিশের আবির্ভাব হ'ল রঙ্গমঞ্চে। আমি তাদের একজনের হাতে একটা ইস্তাহারও রয়েছে দেখলাম। তারা খোঁজ করতে লাগলো যে কি করে এগুলো এখানে এলো। কাজ আমার শেষ হয়েছিল তাই বুদ্ধিমানের মতো সরে' পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমি তো তেমন কিছু উপদেশ পাইনি, তাই সেই জনতা আর অনুসন্ধানকারী পুলিশের মধ্যেই বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। পুলিশকে দেখে লুকিয়ে পড়বার কোন নির্দেশ আমার ওপর ছিল না। তা'ছাড়া ওরকম করতে আমার আত্মমর্যাদারও যথেষ্ট বাধা ছিল। কিন্তু আসল কথা ছিল এই যে ঐ উত্তেজিত

জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশের টিকটিকিদের মুখ লক্ষ্য করার আনন্দ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। পুলিশ জনতাকে ইস্তাহার পড়তে কোনো বাধা দিল না, তারা শুধু অনুসন্ধান করতে লাগলো যে ইস্তাহারগুলো ছড়িয়েছে কে? অবশেষে আমাকে তারা ঠিক বার করলো। আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে বহুজোড়া চোখের দৃষ্টি আমার ওপরেই নিবদ্ধ। কিন্তু কি যে ঘটতে পারে এ সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা ছিল না। হঠাৎ এই লক্ষ্যকারী লোকগুলির মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে বললো যে আমাকে থানায় একবার যেতে হবে। যদিও আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম, আর মনে প্রাণে এটাকেই চাইছিলাম তবুও শুধু মুহূর্তের জন্যে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি তাদের সঙ্গে চৌকীর দিকে যাত্রা করলাম। পথচারীরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। তাদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে চললো।

যাই হোক, আমি ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিকে একটী ছোটখাট জনতা গড়ে' উঠলো, আর আমি থানার দিকে এগুবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভিড়টি বাড়তে লাগলো। যখন দশাশ্বমেধ থানার অফিসে ঢুকলাম তখন সেখানে এক বিরাট জনসমুদ্র। তারা আওয়াজ দিল "মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়।" পুলিশ অবশ্য এই চিৎকারে কর্ণপাতও করলো না। আইনের যন্ত্র ঘুরতে আরম্ভ করলো। এমন কয়েকজন লোক চিৎকার করলে তাদের কিছুই যায় আসে না! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জনতা পাতলা হ'তে লাগলো, আওয়াজ শোনা গেল না! যখন জনতা একেবারে কমে গেল তখন কোদাই-চৌকীর বড় থানায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রকৃতপক্ষে যেখানে আমাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটা পুলিশের একটা ছোট ঘাঁটি ছিল, শেষে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেটাই হলো পূর্ণাঙ্গ পুলিশের থানা। বলতে ভুলে গেছি, প্রথম জায়গাতেই একটা রেজেষ্ট্রার খাতায় আমার নাম, বাবার নাম, উপজীবিকা, সবই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

নোতুন জায়গায় এসে স্কুলের কয়েকজন পুরাতন সঙ্গীকে দেখে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। যাঁরা কখনও গ্রেপ্তার হয়েছেন, মাত্র তাঁরাই জানেন এতে কী রকম আনন্দ হয়। গ্রেপ্তার হ'লে সকলের থেকে এমন বিচ্ছিন্ন

হ'তে হয় যে আমার তো মনে হচ্ছিল যে পৃথিবী থেকেই যেন দূরে সরে এসেছি! এও মনে হচ্ছিল যে যেন আমার গতজীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তাই স্কুলের বন্ধুদেরও আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার হ'তে দেখে খুব আনন্দ হলো। ধরা পড়বার আগে এদের কারুর সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গতা ছিলনা। কিন্তু তবুও থানায় তাদের মনে হ'ল তারা যেন কত আপন। তৎক্ষণাৎ আমাকে তাদের সঙ্গে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হলো। এখানেও আইনের হু'চারটে প্রাথমিক কচাকচি শেষ করে আমাদের জেলা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। থানা থেকে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন দেখলাম ফটকে বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাত-কড়ি বাঁধা অবস্থায় আমাকে দেখে বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কথা বলার সুযোগ ছিল না, তবুও তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন জামীনে খালাস হ'তে আমি চাই কি না। আমাদের নেতাদের নির্দেশ ছিল জামীনে খালাস না হওয়ার। বাবাও জানতেন এ কথা। তিনি এত বিচলিত হয়েছিলেন যে হয়তো সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন, নয়তো বোধ হয় দেখতে চেয়েছিলেন যে জেলে যেতে আমি কতটা প্রস্তুত আছি। আমি তৎক্ষণাৎ বল্লাম—"না।" এর পরে বাবাকে প্রণাম করে জেলে যাবার জন্যে গাড়ীতে উঠে বসলাম, বাবা ধীরে ধীরে ক্লান্তভাবে চলে গেলেন।

এতদিন অবধি জেলের নামই শুনেছিলাম, জানতাম না—জেলটা কি। জেল-ফেরৎ এমন কারুর সঙ্গেও আমার জানা ছিল না, যাতে জেলের কথা জানতে পারি। আমাদের স্থানীয় নেতা এমন কি প্রাদেশিক নেতারাও জেল-ফেরৎ ছিলেন না। আমি শুনেছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীকে জেলে যেতে হয়েছিল, কিন্তু তার বিষয়ে কেউ বিশেষ করে আমি তো কিছুই জানতাম না। এসব কথার উল্লেখ করছি এই জন্যে যে তখন অবধি জেল ছিল পরম রহস্যময়, কেউ জানত না সেখানে কি হয়। সে সময় পুরাতন বিপ্লবীরা ছাড়া জেলে কেউই যায়নি। আর তাঁদের জেলের বিবরণ যা শুনতাম তাতে তো মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠতো।

আমরা যখন জেলখানায় ঢুকলাম তখন তার ব্যারাকগুলোয় তালা দেওয়া হ'চ্ছে। আমাদের প্রাথমিক নিয়মগুলি, যেমন,—নাম, বাবার নাম, জীবিকা, বয়স, যখন ধরা পড়লাম তখনকার বিশেষ বর্ণনা, ইত্যাদি খুব তাড়াতাড়ি করে' সারা হ'ল। তারপর হ'ল দেহ মালতল্লাস। তারপর আমাদের জেলের বিচারাধীন থাকবার লোকদের অংশে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি ছিলাম কৌতুহলী, সেই সঙ্গে ভয়ও ছিল খানিকটা। কি যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, আমরা তা কিছুই জানতাম না। আমাদের নয় বা দশ ব্যাস বিশিষ্ট মাঝারি আকারের একটা কড়াই, ওদেশে বলে "তম্‌লা", তার চেয়ে ছোট আকারের একটা কড়াই বা তমলাও "কটোরী," একটা মাদুর, আর দুটো রুক্ষ কম্বল দেওয়া হলো। এই হলো আমাদের সমস্ত সম্পত্তি, না বালিশ না পাশবালিশ, না হাতা, না চামচ। তাঁরা ভাবতেন তম্‌লা আর কটোরীই সব অভাব মেটাবে।

যাই হোক, এরাই হলো আমাদের নোতুন সঙ্গী। সৌভাগ্যের বিষয় এরা আমাদের তাদের সমপর্যায়ে ফেললে না। তাদের চোখে এমন কিছু ছিল, সেটাও আমাদের তফাৎ করে রেখেছিল। আমরা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ছিলাম বলেই যে আমরা তাদের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করতাম না, তা নয়, এর কারণ আছে আলাদা। এদের সঙ্গে আমাদের সবশ্রেণীর লোক, এমন কি উচ্চশ্রেণীর লোকও ছিল। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা না করে' দূরে থাকবার চেষ্টাই করতো। সাধারণ খাদ্য পরিবেশন হ'য়ে গিয়েছিল, উঠান আর ব্যারাক একটা অদ্ভুত গন্ধে পূর্ণ ছিল, তখন যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হ'ত ঐ গন্ধটা কিসের তবে আমরা তার উত্তর দিতে পারতাম না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঐ গন্ধটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হ'য়ে গেলাম। আমাদের বাসনপত্র ঠিক করে' খাবার নিতে বলা হলো। প্রথমদিন বলে' ওয়ার্ডারটি একজন বিচারাধীনকে বললে আমাদের তম্‌লা আর কটোরী মেজে দিতে। অল্পসময়ের মধ্যেই তারা এটা করে ফেললে আর আমরাও চাপাটি আর ভূজিয়া পেলাম।

এই কাঁকরপূর্ণ চাপাটি আর এই সব্জী খাওয়াটা জীবনের এক নোতুন

অভিজ্ঞতা। কিন্তু ছোট ছিলাম বলে সহজভাবেই এগুলো নিলাম, আর চতুর্দিকের কৌতুহলী চোখের সামনে দুটো চাপাটি খেয়ে ফেললাম। জেলে যেটার সবচেয়ে অভাব বোধ হয় সেটা হলো প্রতিপদে নির্জনতার অভাব। অবশ্য যাঁদের অবস্থা একটু ভালো তাঁরাই এর অভাবটা অনুভব করেন। কিন্তু বেশীর ভাগ কয়েদী এই অভাব বুঝতে পারেন না, কেননা, জেলের বাইরেও নির্জনতা ভোগ করবার মতো বিলাসিতা করা তাঁদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না। এমন কি জেলে পায়খানার নির্জনতাও নেই। যাতে কেউ নির্জনতা ভোগ করতে না পারে তার জন্যে পাহারাদার আর ওয়ার্ডারের তীক্ষ্ণ নজর সর্বদা আছে। জেলে খাবার নির্জনতারও অভাব আছে। প্রায় পনেরোজন অপরিচিত, শুধু অজানা বলে নয় যাঁরা নানাদিক থেকেই অপরিচিত, তাঁদের চোখের সামনে খাওয়া সত্যিই বেশ কষ্টকর। অবশ্য তাই বলে যে কম খেতাম সে কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। কেননা, আমি এই সমবেত দোষীদের দেখাতে চাইতাম যে তারা আমাকে যত ছেলেমানুষ ভাবছে ততখানি ছেলে মানুষ আমি নই, এই জন্যে খুব বীরত্বের সঙ্গে যতটা পারতাম তার চেয়ে বেশী খেতাম। এটার একটা ভালো ফল হয়েছিল। কেননা এর পর থেকে যখনই খেতে দেওয়া হ'ত, তখনই আমি এইভাবে বীরত্ব দেখিয়ে বেশী করে খেতাম, তাতে আমার শরীর ভালো থাকতো। যারা জেলে যান নি তাঁরা কল্পনা করতেও পারতেন না যে ১৯২১ সালে জেলের অবস্থা কেমন ছিল।

রাত্রের মত ব্যারাক বন্ধ হয়ে গেল। আমরা যারা একই অপরাধে বন্দী হ'য়েছিলাম তারা এক জায়গায় জড়ো হ'যে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম! আমাদের অর্ধেককে অবশ্য এরই সংলগ্ন এক ব্যারাকে বিচারাধীনদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। বন্দীরা তো আর নিজের ইচ্ছামত যেখানে হোক ঘুমাতে পারে না। নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে শুতে হবে, অন্য জায়গায় শোয়া মানেই জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা। আমরা এক জায়গাতেই শুতে চাইলাম। কিন্তু এই মামলার কয়েদীদের পৃথক রাখার আইন অনুসারে আমাদের পৃথক পৃথকই শুতে হলো। আমরা তখন এর কারণ বুঝতাম না, তাই এটাকে ভীষণ অন্যায় বলেই ধরে' নিলাম, আর, এটা যে পুলিশদেরই কারসাজি এ ভেবে তাদেরও

দোষ দিতে লাগলাম। আমরা বাড়ী থেকে দূরে ছিলাম না, ছিলাম মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। কিন্তু তাতেই মনে হচ্ছিল কতদূর! আর, সামান্য মাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ থেকেই আমরা যখন বঞ্চিত হলাম, তখন আমরা এক সঙ্গে বসে' দু'একগজ সুতো কাটাও পরম সৌভাগের বিষয় বলে' ভাবলাম। এই সময়ে একজন কয়েদী পরিদর্শক আমাদের ভদ্রভাবে বললে যে আমাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়া উচিত নয়তো আমাদের জিনিষ চুরি হয়ে যেতে পারে। সে চোখের ইঙ্গিতে এমন লোককেও দেখিয়ে দিলে। এটা আর একটা চমক। জেলের মধ্যে চুরি! চুরি করবার দোষেই লোকদের এখানে পাঠানো হয় আর তালা-দেওয়া ব্যারাক থাকা সত্ত্বেও চুরি হয় কিনা জেলে! সত্যিই এখানে আমরা যা যা শিখেছিলাম আমাদের সব পূর্বধারণাকে বদলেই তা শিখতে হ'য়েছিল। প্রথমে তো আমি তৎক্ষনাৎ উঠে আমার জায়গায় ফিরে গিয়ে আমার জিনিষপত্র রক্ষা করতে লেগে গেলাম। আমি যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেটা আমার পক্ষে স্বাভাবিকও। কেননা, এই শ্রেণীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রবল আর যার যত সম্পত্তি তার তত সম্মান এই নিয়মই প্রচলিত। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন ভাবলাম যে সম্পত্তির মধ্যে তো দুটো কম্বল, একটা মাদুর, একটা তম্‌লা আর একটা কটোরী তখন আমার পাহারা দেবার উৎসাহ রইলো না। এখন অবধিও বন্দীজীবনে এইগুলির দাম যে কত তা' আমি বুঝতে পারিনি।

ক্রমশঃ রাত হয়ে এলো, আলো জলে উঠ্‌লো। কিন্তু আলোটা এতই ম্লান ছিল যে তাতে পড়া চলে না। এ সময়ে আমাদের কাছে কোনো বইও ছিল না। কয়েকজন বিচারাধীন ব্যক্তির খানকয়েক বই ছিল। জিজ্ঞেস করে' জানলাম যে আমাদেরও বই দেওয়া হবে। কিন্তু সে বিষয়ে আর আমরা মাথা ঘামালাম না। বইএর চেয়ে পারিপার্শ্বিকতাই আমাকে বোধ হয় আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের চারিদিকের সব মানুষকেই আমাদের অদ্ভুত লাগছিল, অবশ্য তারা আমাদের বিশেষ আমল দিত না। আমাদের লেপ ইত্যাদিরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না, রুক্ষ কম্বলেই আমাদের বেশ চলে যেত।

জেল প্রবেশের প্রথম দিন থেকে বা প্রথম রাত থেকেই একটা নোতুন শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো—"তিকড়ম"। এটাকে অনুবাদ করা যায় না। জেলে তামাক নিষিদ্ধ তবুও আমি চারিদিকে সকলকে "বিড়ি"-পান করতে দেখতাম। এইগুলো খাওয়া যেত "তিকড়ম" বা বে-আইনী চালানের দ্বারা। জেলে কয়েদীদের খুব কমই চিঠি আদানপ্রদান করতে দেওয়া হ'ত। আমি আমাদের মধ্যেও কয়েকজন বিচারাধীন কয়েদীকে দেখলাম যারা প্রত্যহ ভেতরে আর বাইরে চিঠি আদানপ্রদান করে। এটাও 'তিকড়ম'। জেলে আমাদের জেলের খাবারই দেওয়া হতো ; কিন্তু জানতে পারলাম যে বিচারাধীন আর জেলের কয়েদীরা হয় বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নয়তো জেল-গুদাম আর জেলের বাগান থেকে খাবার আনিয়ে তাদের আইনানুযায়ী খাবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে ? এগুলি সবই 'তিকড়মে'র পর্যায়-ভুক্ত। তবে প্রথমটা হলো নিজেরই খাবার আনান, তবে বে-আইনী ভাবে, আর শেষোক্তটা একেবারে চুরীর পর্যায়ে পড়ে। বন্দী পাচককে বাড়তি পয়সা দিয়ে ভালো করে চাপাটি সেঁকালে সেটা 'তিকড়মে'র পর্যায়ে পড়ে। বিচারাধীন বন্দীদের কামাতে বা পোষাক বদলাতে দেওয়া হতো না। উদ্দেশ্য হলো তাদের পরিচয় যাতে লুকিয়ে না যায়। কিন্তু 'তিকড়মে'র সাহায্যে তারা নোতুন কাপড়চোপড় আনাতো, আর পোষাক পরিবর্তনও করতো। কাজেই যে উপায়েই হোক কয়েদীরা জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করতো, সে খাবার বা কাপড় আনিয়েই হোক, কিংবা দৈহিক বা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করে' হোক, সবই জেলের ভাষায় 'তিকড়ম'। প্রথম রাতেই বিচারাধীন কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা বাড়ীতে কোনো খবর দিতে চাই বা কোনো কিছু বাইরে থেকে আনাতে চাই কিনা। তারা আমাদের সাহস দিয়ে বললে যে এটা খুব সহজ। প্রমাণস্বরূপ তারা দেখাল যে তাদের কাছে কিছু টাকা আর সামান্য ভাঙানী আছে। যারা খবর দিল তাদের সবাই যে এক একজন ওয়ার্ডারের লোক সে কথা মনে করবার কারণ নেই। তাদের কয়েকজন সত্যিই আমাদের প্রয়োজনে লাগতে পারতো। 'তিকড়মে' আমাদের দরকার নেই শুনে তারা খুবই অবাক হলো। যাই হোক্ একটা ব্যাপারে 'তিকড়ম' আমাদের খুব কাজে

লাগলো, আর তৎক্ষনাৎ আমরা এর খপ্পরে পড়লাম। দু' তিনদিন আগে কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী ধরা পড়েছিলেন, আমরা তাঁদের বিষয় জানতে চাইলাম। তাঁদের বিষয় জানতে চাইবামাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের কথাবার্তা কাজ-কর্মের বিষয় জানতে পারলাম। প্রথম জিনিষ যেটি আমরা জানলাম সেটি হলো যে তাঁদের সাধারণ কয়েদীদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। বিচারাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যিনি খুনের ব্যাপারে প্রায় একবৎসর এখানে আছেন, বল্লেন যে বোধ হয় পরদিন আমাদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সম্ভাবনায় আমরা অবশ্য খুবই উৎফুল্ল হযে উঠলাম।

পরদিন আমাদের সকলকে একটি ব্যারাকে আনা হলো। এতে স্বভাবতই আমরা খুব খুসী হলাম। এই উপায়েই গবর্ণমেণ্ট আমাদের সত্যিকার রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ধরলো। কিন্তু বাইরে আর আইনগতভাবেও রাজনৈতিক-বন্দী বলে' কোন বিভাগ ছিল না। কাজেই অনেক গণ্ডগোলের স্থত্রপাত হলো। আমাদের যদিও সাধারণ কয়েদীদের মতোই খাবার দেওয়া হ'ত তবুও জেলের অতি বোকা কর্তৃপক্ষও বুঝেছিল যে সাধারণ কয়েদীদের মতো আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করলে চলবে না। তারা তাই তাদের পর্বত-প্রমান বোকামী সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চাইতো। আইনে অবশ্য আমাদের সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্য ঘটাবার নির্দেশ ছিল না; কিন্তু তবুও কর্তৃপক্ষ তারতম্য করতেন। যেমন জেলর জেলদর্শন করতে ব্যারাক বা উঠানে এলে কোনো সাধারণ কর্মী যদি উঠে' না দাঁড়াত তবে তাকে একটা অসম্মানজনক ভঙ্গীতে বসিয়ে রাখা হতো। আমাদের কাছ থেকে অমন ব্যবহার আশা করা হ'ত না। জেলর, গ্রেপ্তারের দ্বিতীয় দিনে, যে দিন আমাদের পরিদর্শন করতে এলো তখন আমরা রোদ পোহাচ্ছিলাম। একজন এগিয়ে গিয়ে আমাদের কি কি অভিযোগ আছে সে কথা বলে এলো।

শুধু ইস্তাহার বিলি করবার জন্যেই আমাদের অভিযুক্ত করা হলো না। জনচলাচল বন্ধ করা আর সাধারণ শান্তিভঙ্গের জন্যেও আমরা অভিযুক্ত হলাম। কাজেই ১০৮ ধারা আমাদের পক্ষে বলবতী হলো। আমি জন-চলাচলে বাধা দিয়েছিলাম কিনা জানি না; কিন্তু একটা ইস্তাহারকে ঘিরে যে

পাঁচ ছ'জন লোক জমে উঠেছিল বোধ হয় তাকেই তারা সেই আখ্যা দিয়েছিল। আমাদের প্রতি আদালতের সঙ্গে অসহযোগ করবার হুকুম ছিল, তাই আমরা মামলায় অংশ গ্রহণ করলাম না, আমরা কোনো উকীলও নিযুক্ত করিনি। আমাদের বিবৃতি দিতে বলা হলে আমরা প্রত্যেকেই বল্লাম যে গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব আর খিলাফৎ অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত, এই আদালতগুলো তারই প্রতিনিধি, তাই আমরা কিছুই বলবো না। আদালত গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ ছিল। দুই চারজন নিকট আত্মীয়ই ঢুকতে পেরেছিলেন, বাকী জনতা অপেক্ষা করছিলেন বাইরে।

সাক্ষী দেওয়া আর আমাদের বিবৃতি দেওয়া শেষ হলে আদালত কয়েক মিনিটের জন্যে ভঙ্গ হ'ল, তারপর রায় দেওয়া হ'ল। আমাদের প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল। জনতা তৎক্ষণাৎ সে খবর পেযে গেলো; তারপরেই আরম্ভ হলো তাদের আনন্দধ্বনি, চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তাদের শ্লোগানে। আমাদের তৎক্ষনাৎ জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমাদের যে ধারায় বন্দী করা হ'ল তাতে বণ্ড্ লিখে দিলে আমাদের জামীনে খালাস হওয়ার উপায় ছিল। কিন্তু আমাদের ওপর জামিন নেবার হুকুম ছিল না। তা'ছাড়া আমরাও সে কথা ভাবতে পারিনি। আমাদের বেরিযে আসবার আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন সেই অবস্থা ছিল যখন বন্দীদের জেলের ভেতর নিয়ে গেলে জনতাও তাদের জেলের ভেতর নিয়ে যাবার জন্যে দাবী করতো। Dr. Abdul karim যখন বন্দী হলেন তখন ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। তিনিই বেনারসের প্রথম বন্দী হন। বিরাট এক জনতা তার সঙ্গে গেটে গেল, আমিও সেই জনতার মধ্যে ছিলাম। জনতা একবার চেষ্টা করলো পুলিশের সুরক্ষিত ব্যুহ থেকে ডাক্তারকে বার করে আনবার। কিন্তু ডাক্তার বা সঙ্গের নেতারা কেউই একাজে উৎসাহ দিলেন না। শুধু তাই নয় "শান্তি" "শান্তি" বলে তাদের থামালেনও। এতে জনতার মত পরিবর্তিত হলো আর তারাও ডাক্তারের সঙ্গে জেলে যেতে চাইলো। তাই জেলে পৌঁছুবার পর জেলের দ্বারোয়ান কিছুতেই ফটক খুলে দিলো না। কেননা তার বিলক্ষণ

ভয় ছিল যে ফটক খুলে জনতাও গেটের মধ্যে ঢুকে পড়বে। বহু কষ্টে নেতারা তো তাদের থামালেন আর Dr. Abdul karimও নির্বিঘ্নে জেলফটকে ঢুকে পড়লেন।

আমরা আসবার পর থেকেই যে-রুটি আমাদের দেওয়া হচ্ছিল তা' আমাদের পক্ষে গলাধঃকরণ করা অসম্ভবই হ'য়ে উঠলো। একদিন কয়েকজন সামনা-সামনিই এই অখাদ্য কাঁকড়ভর্তি রুটি খেতে আপত্তি জানাল। এই দলটাই সবচেয়ে প্রথমে সব ঝগড়া আরম্ভ করতো, এবারেও তাই হলো। কিছুই আগে থেকে ঠিক করা ছিল না। হঠাৎ সবাই রুটি ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর যুদ্ধও আরম্ভ হ'যে গেল। নেতারা এসবের পেছনে থাকতেন, আগে নেতৃত্ব করতেন না। কিন্তু অনশন আরম্ভ হ'লেই তাঁরা সাম্‌নে এগিয়ে আসতেন। তাঁরা বললেন, একজনকে প্রতিনিধি করে পাঠাতে হ'বে কথাবার্তা চালাবার জন্যে। এইভাবে গবর্ণমেণ্টকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হোক। কাজেই এভাবে ধর্মঘটটা এবারের মত বন্ধ করা হ'ল।

নেতারা বুঝলেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের সারাদিন বাজে কথাবার্তা বলে এদিক ওদিক ঘোরা উচিত নয়। কাজেই ঠিক হলো নানারকম ক্লাস খোলা হবে। এই সময়ে 'পাঠচক্র' কথাটি প্রচলিত ছিল না, এই সব মিলনকে আমরা বলতাম 'ক্লাস'। বাবু সম্পূর্ণানন্দ গীতার ওপর বক্তৃতা দিতেন। এতে খুব ভীড় হতো, কেননা অনেকে এটাকে 'কথা' বা 'ধর্ম-উপদেশে'র ক্লাস বলে ভাবতেন। এই সময় বাবু সম্পূর্ণানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলতেন না। অবশ্য ভারতের মধ্যে কেউই সে সময়ে নিজেকে ঐ নামে পরিচিত করতেন না। তাঁর ক্লাসটা খুব সাফল্যলাভ করেছিল, এমন কি কয়েকজন মুসলমানও তাতে যোগ দিয়েছিল। বাবু সম্পূর্ণানন্দ খুব ভালো বক্তা ছিলেন তাই তাঁর ক্লাসে নিয়মিতভাবে পঞ্চাশজন যে যোগ দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তী সময়ে তিনি সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হয়েছেন, পরবর্তী কালে পন্থ-মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রীর পদও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আসলে আমার মনে হয়

তিনি মনে প্রাণে গীতার প্রচারক, খুব পণ্ডিত লোক, সমাজতন্ত্রবাদী নন, বলা ভালো বৈদান্তিক।

অন্য ক্লাশ নিতেন অধ্যাপক কৃপালনী। গান্ধীস্কুলের সকলে এবং আরও কেউ কেউ এতে যোগ দিতেন। অবশ্য নিয়মিত উপস্থিতের সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে গীতার ক্লাসের মত এ-ক্লাস এত সাফল্যলাভ করেনি। এটা অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল, কেননা, কৃপালনী বক্তৃতা দিতেন মেজিনীর 'মানুষের কর্ত্তব্যে'র ওপর। আর ইচ্ছে করেই তিনি ক্লাসটাকে একটু বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক প্রকৃতির করে' তুলতে চাইতেন। বিশ্লেষণ করে' দেখলে অবশ্য 'গীতা' আর 'মানুষের কর্তব্যে'র অন্তর্নিহিত দার্শনিকবাদ খুব বেশি বিভিন্ন নয়। কিন্তু কৃপালনী দিনে মাত্র এক প্যারা করে পড়াতেন। আর ওর ওপর প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা দিতেন। মন্তব্য প্রকাশের সময় তিনি হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচনা করতেন। এই সময়ে অবশ্য এই সব মন্তব্য আমরা সব ঠিক পরিপাক করতে পারতাম না। শ্লেষ, অপূর্ব হাস্যরস, আর সেই সময়ে সুন্দর বিষয় বস্তুর গুণে তাঁর বক্তৃতা আমাদের খুবই প্রিয় ছিল।

এছাড়া এমন আরও অনেক নেতা আর লেখক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। যেমন বেচান শর্মা, উগ্রারামনাথলাল সুমন, কমলাপতি শাস্ত্রী, বিচিত্রনারায়ণ শর্মা, রঘুনাথ সিং, বাবু রাঘবদাস, যোগেন্দ্র শুকলা, এঁরা সবাই পরে কোনও না কোন দিকে বড় হয়েছিলেন। অল্পদিন পরে প্রস্তাব করা হলো 'কারাগার' নামে একটি হাতে লেখা হিন্দী সাপ্তাহিক বের করা হোক্। এর সম্পাদক হলেন উগ্রারাম সুমন ও অন্যরা লেখকশ্রেণী-ভুক্ত হলেন। লেখার এত চাহিদা ছিল যে আমাকেও লিখতে বলা হ'ল আর আমি লিখতামও।

অল্প দিনের মধ্যে আমি মারাঠি শিখলাম। অনেকে অনেক কিছুই শিখতে লাগলো। কিন্তু বেশির ভাগ লোক বাংলা শিখতে লাগলো।

এর সঙ্গে সমানভাবে জেলের নিয়ম আর অনিয়মের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে লাগলো। আমরা যারা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম তারা নিজেদের পোষাক পরতে পেতো। কিন্তু এখন লোকেরা প্রায়ই সশ্রম কারাদণ্ড

পেতে আরম্ভ করলো। আর তাদের নিজের পোষাক পড়বার অধিকার রইলো না—তাদের পড়তে দেওয়া হলো খুব খারাপ সেলাই-করা হাফসার্ট আর তার সঙ্গে জাঙ্গিয়া। তাতে দেহের অতি অল্প অংশই ঢাকতো। তোয়ালে দেওযা হতো না তার বদলে অতি ক্ষুদ্র একটুকরো কাপড় দেওয়া হ'ত। অবশ্য এগুলো ছাড়া একটা করে টুপিও দেওয়া হ'ত। সে সময়ে দোষীদের এ কাপড় এক প্রস্থ করে দেওযা হ'ত না। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা এসব পরতে গররাজী হলো। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হ'ল। কিছু কিছু কাজ করতে হতো। moonjgrass ব্যারাকে পাঠানো হতো পাতলা দড়ি বানাবার জন্যে। প্রথমে এদিকে কেউ নজর দিত না। তারপর খেয়াল হলো আচ্ছা এটাকে পুড়িয়ে ফেললে কেমন হয়? যেই মনে হওয়া অমনি তাকে কার্যে পরিণত করা হলো। কর্তৃপক্ষরা রাগারাগি করলো বটে কিন্তু ঘাস পাঠানো তারা বন্ধ করলো। কাজেই পরিশ্রমের প্রশ্নেরও ইতি হলো। সাধারণ কয়েদীকে গলায় একটা লোহার বালা পড়তে হতো, তাতে একটুকরো কাঠ ঝুলানো থাকতো। ঐ কাঠে তাঁর রেজিমেণ্টের নম্বর, তার দোষ, শাস্তি, তার ছাড়া পাবার তারিখ লেখা ছিল। যে যে নিয়মগুলো মেনে চলতে হতো তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে অসম্মান-জনক। যথাবিধি রাজনৈতিক বন্দীরা এটা পরতে অস্বীকার করলো। কিছুদিন পরে সাধারণ বন্দীরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো আর দিনকয়েক পরেই এই কাঠের তক্তি আর কোথাও দেখা গেল না। অসহযোগ আন্দোলনের বহু "সংস্কার" নষ্ট হয়েছে কিন্তু এগুলো কখনও নষ্ট হয়নি।

এ সংস্কারগুলো সবই 'না'-ধর্মী ছিল। আমাদের যা করতে বলা হতো আমরা তা করতাম না, আমাদের যা পরতে বলা হ'ত আমরা তা কখনও পরতাম না, এমনই সব সংস্কার ছিল ঐগুলি। কিন্তু এগুলোতে ভাল খাদ্যের সমস্যার মীমাংসা হয়নি। জেলের কর্তৃপক্ষদের ভয় দেখান হ'ল। খাদ্যের অবস্থা ভালো করবার জন্য ধর্মঘটের আয়োজন করা হ'ল। তার ফলে আমাদের এমন রুটি দেওয়া হ'ত যাতে কাঁকর নেই, ভালো করে সেগুলো সেঁকাও হ'ত, ডাল গাঢ় করা হ'ত, ডাক্তারের আদেশে কয়েকজনকে দুধ দেওয়া হ'ত,

তার চেয়ে বেশী অবশ্য কিছু নয়। স্থানীয় জেল-কর্তৃপক্ষের জেলের প্রত্যেকের খাবার সম্পূর্ণভাবে বদল করার শক্তি ছিল না। তাই ঝগড়ার প্রয়োজন ছিল। কাজেই অনশনের পথ অবলম্বন করা হলো। প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীই এতে অংশ গ্রহণ করলো। অনশন একটা অস্ত্র নয়, আর এতে সবাই যোগ দিতেও পারে না। যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে পারে, একমাত্র সেই-ই এই পথ গ্রহণ করতে পারে। আমরা অনশন আরম্ভ করা মাত্র আমাদের কম্পাউণ্ডের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। আর কর্তৃপক্ষও কড়াভাব অবলম্বন করলেন। আমরা যারা অধ্যাপক কৃপালনীর যুবকদল বলে' মাতছিলাম তারা আর কয়েকজন একটা ব্যারাকে বাস করতাম। সেখানে চিঁড়ে ছিল। বড়রা কোনরকম খাবারই গ্রহণ করতেন না, কিন্তু তাঁরা আমাদের মতো ছোটদের এইগুলো খেতে জোর করতেন। পরে আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখেছি যে এটা বিশেষ ভাল কাজ তাঁরা করেননি। কর্তৃপক্ষ জানতো যে আমরা সকলে অনশন করছি। কিন্তু আমাদের কয়েকজন তো তা করেনি। এটা কর্তৃপক্ষকে জানান উচিত ছিল। যাই হোক, দু'চারজনের কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক বন্দীরা সত্যিই অনশন করেছিলেন। আমরা যারা খাচ্ছিলাম তারাও দু'দিন অনশন করবার হুকুম পেলাম। দ্বিতীয় দিনের বিকেলে আমরা অনশন ত্যাগ করলাম। এতে খারাপ কিছুই ছিল না, কিন্তু এটা কর্তৃপক্ষকে জানান উচিত ছিল।

যাই হোক, তৃতীয় দিনের বিকেলে সকলেই অনশন ত্যাগ করলেন। আমার বেশ মনে আছে যে কয়েকজন নেতা বাইরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জেলে এল আমাদের নেতাদের কি সব খবর দিলেন, আর তার পরেই তাঁরা অনশন ত্যাগ করলেন। আরও কোথাও নিশ্চয়ই এরকম অনশন চলছিল। এইসব ধর্মঘটের ফলে সরকার দুটো ভাগ করে দিল। প্রথম শ্রেণীর অপরাধী, দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধী। এইভাবে সরকার রাজনৈতিক বন্দী বলে বিশেষ কাউকে নির্বাচিত করলো না। অধিকন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল না, অনেকেই এই দুই শ্রেণীর বাইরে পড়লেন। আর তাঁদের রাজনৈতিক বন্দীই বলা হ'ল না। কয়েক জায়গার

ম্যাজিস্ট্রেটরা ভালো ছিল। তারা সকলকেই প্রথম শ্রেণীর সুবিধা দিত। কোনো কোনো জায়গায় আর কটিকেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হ'ত না। ফৈজাবাদ, দ্বিতীয় শ্রেণী আর লক্ষ্ণৌ প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জন্যে নির্ধারিত হ'ল। অধ্যাপক কৃপালনী শেষোক্তটায় আর আমরা প্রথমোক্তটায় গেলাম।

অসহযোগের ধারা থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন উৎপন্ন হলো। আগেই বলেছি বাংলার বিপ্লবীদল অসহযোগ আন্দোলনের গবেষণা কালের জন্যে তাঁদের কার্য্যধারা বন্ধ করবার কথা দিয়েছিলেন। তাঁরা খুব ভালোভাবেই তাঁদের প্রদত্ত কথা পালন করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যখন বন্ধ হ'য়ে গেলো, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, এই আন্দোলনের পুনর্জাগরণের আর সম্ভাবনা রইলো না, কংগ্রেস আইনসভায় প্রবেশ আর গঠনমূলক কার্যপ্রণালী গ্রহণ করলো তখনই বিপ্লবীরা তাদের পুরাতন দল সংগঠন করে যুক্ত সম্প্রদায়ের কাছে আনাগোনা আরম্ভ করলো।

বাংলার পুরাতন বিপ্লবী আন্দোলন মূলতঃ ছিল যুবক আন্দোলন, তবে যেমন উল্লেখ করেছি এটা জনসাধারণের মধ্যেও গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলন যাকে বেঁচে থাকতে হয় নিজের সামর্থ্য আর গোপনীয়তার মধ্যে, সেটার পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু এটার পক্ষে জনসাধারণের সহানুভূতিই হলো জীবনরস। এ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। যদি বিপ্লবী শহীদকে বীর আর মুক্তিদাতা বলে' জনসাধারণ গ্রহণ না করে তবে কোনো বাস্তব কাজ করা ঐ বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। মনে করা যাক বেপরোয়া কয়েকটি ছেলে জনসাধারণের নিন্দা আর প্রশংসার প্রতি দৃকপাত না করেই কাজ করে' গেল, তবে তাদের সঙ্গেই কাজেরও সমাপ্তি ঘটবে। এই পার্টিতে লোক আসা তবেই সম্ভব যদি জনসাধারণ সহানুভূতিশীল থাকে, যদি বিপ্লবীদের তারা বীর আর মুক্তিদাতা বলে ভাবে!

১৯১৪-১৯১৮ সালের যুদ্ধে ভারত, আমেরিকা আর ইউরোপে বিপ্লব খুব

জোরালো হয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্যদের তাদের দিকে আনবার চেষ্টা হয়েছিল, কতকগুলোকে আনাও হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রে যোগদানকারী সৈন্যদের কোর্ট মার্শালের খবর এখনও অলিখিত আছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অংশ গভর্ণমেণ্টের অধীন বিভাগের অধিকারে আছে আর আমরা তাই তাদের বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। সিঙ্গাপুর বিদ্রোহ প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা এইসব ব্যাপারের ছায়া দেখতে পাই। এই ব্যাপারে ভারতীয় সৈন্যরা বিপ্লবীদের দিকে চলে' এসে বিদ্রোহ করেছিলেন, কয়েক-দিনের জন্য বন্দরটিকে একেবারে নিজেদের অধীনে এনেছিলেন, আর বৃটিশ নৌ-বাহিনী ভারত আর জাপানী নৌ-বহরের সাহায্যেই তাঁদের ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছিল। হামীরপুরের পণ্ডিত পরমানন্দ এই বিদ্রোহে একটা বড় অংশই গ্রহণ করেছিলেন। মীরাট সেনানিবাসের মধ্যে এক পিঙ্গ্‌লেকে বোমাসমেত ধরা হয়েছিল, তারপর তাকে ফাসী দেওয়া হয়। যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে আর তারপরে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল সব তাতেই ইঙ্গ ভারতীয় সৈন্যদের রাজার প্রতি আনুগত্যকে নষ্ট করার চেষ্টাই ছিল সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

আন্দোলনের খুঁটিনাটি আমি এখানে দিতে পারবো না। কেবল মোটামুটি ব্যাপারগুলো বলবো। এই সম্বন্ধে বিপ্লবীদলের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের "বন্দীজীবন" বলে একটি সুন্দর বই আছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এ বিষয়ে একটী সুন্দর বই লিখে এই আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেছেন। পূরাকালের বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী না বলে Blanquist বলে পরিচয় দেওয়া উচিত। সিডিশাশ্‌ কমিটী কর্তৃক লিখিত সরকারী রিপোর্টেও এই কথা বলা হয়েছে যে সে যুগের বিপ্লবীরা হঠাৎ বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করার পন্থায় বিশ্বাস করত, যদিও এতে বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে হত্যা আর ডাকাতির ওপর। এমন কি সে সময়ের মহারাষ্ট্রের ভুমিতে কোকাকার ভ্রাতৃদ্বয়ও গভীরভাবে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের কাজ যে সন্ত্রাসমূলক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁদের কাজে পূর্ববর্ণিত Balanquistic ছিল না যে তাতে সন্দেহ নেই। তবে অবশ্য মহারাষ্ট্রে যে সব গোলমাল পাকছিল এটা ছিল

তারই চরম রূপ। ১৮৯৩ সালে লোকমান্য তিলক "গণপতি" উৎসবের প্রবর্তন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একেবারে রাজনৈতিক, কিন্তু উৎসবের একটা বাহ্যিক ধর্ম্মীয় ভাব থাকে। অবশ্য সে সময়ে যে আবহাওয়া ছিল তাতে এই ধর্মীয় মুখোসের প্রয়োজন ছিল। তাতে সরকারের দৃষ্টি পড়েনি এদিকে, আর অশিক্ষিত লোকদের দৃষ্টিও বহু পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছিল।

'গণপতি' উৎসব লোকের মাঝে বীরত্ব আর দেশপ্রেম আনাবার জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যুবকদের লাঠির সামনে দাঁড়াতে শেখবার বিদ্যা শেখান হলো। উদ্দেশ্য ছিল একত্রিত জীবন আর চিন্তার একতা আনতে সাহায্য করা। ১৮৯৫ সালে লোকমান্য অপর এক উৎসবের সূচনা করলেন— শিব্‌জী উৎসব। এটা খুব বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক উৎসব ছিল, কেননা, 'গণপতি' উৎসবের মতো রহস্যময় দেবতাকে কেন্দ্র করে এটা গড়ে' ওঠেনি, উঠেছিল শিবাজীর মত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। এটা লোকেরা উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। পরোক্ষভাবে লোকমান্য বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করতেই উৎসাহ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবিচ্ছেদ বঙ্গবাসীকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিচ্ছেদকে একটা মীমাংসিত ঘটনা বলে প্রকাশিত করা হলো, আর সমস্ত বাংলায় ঐ দিনটিকে "শোকদিবস" বলে পালন করা হলো। বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোজই জোরালো হ'তে লাগলো। প্রোগ্রামের প্রধান তালিকা হলো বিদেশীবর্জন আর স্বদেশীগ্রহণ। কি করে এই আন্দোলন বৃটিশ ব্যবসাকে বহুল পরিমাণে আঘাত করে' দেশীয় বুর্জোযাকে এক বিরাট সুযোগ দান করলো এটা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

১৯০৬-৭ সালের রাজস্ববিভাগীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, "দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা বাড়ায় তাঁতীরা fly wheel-এর দ্বারা মাসে কুড়ি টাকা রোজগার করতে লাগলো। ঐ শ্রেণীর গড়পড়তা আয়ের প্রায় দ্বিগুণ।" আবার পূর্ববাংলার শাসনবিভাগায় রিপোর্টে (১৯০৫-৬) বলা হয়েছে, কারখানার বহুল বৃদ্ধি হয, বিদেশী দ্রব্যের আমদানী যেমন নূন, মদ আর কাপড়, শতকরা

যোগ ভাগ কমে যায়। ঢাকায় কালেক্টরকে ১৯০৬-৭ সালের রিপোর্টে বলতে হয়েছে যে স্বদেশীভাবের (spirit) এত দ্রুত প্রচলন হলো যে এমন কি ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জের পতিতা রমণীরাও তথাকথিত স্বদেশী-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং বিদেশী বস্ত্রবর্জনের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ সালের মে মাসে, Times বলেন যে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের ভারতীয় আমদানী ৪২, ৪৯২, ৫০০ গজ দাঁড়িয়েছিল। Mr. Wavinson নিম্নলিখিত কথায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারের কথা লিখে' গিয়েছেন, "আন্দেলন এত জোরালো হয়েছিল যে বোম্বাই-এ আমি আশীটি বা নব্বইটি কাপড়ের কল অতি দ্রুত কাজ করেও বাংলার চাহিদা মেটাতে পারছে না। কাপড় তো বটেই তা'ছাড়া প্রত্যেকটি ব্যবসায়েই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল। কোলকাতায় স্বদেশী দেশলাইএর কারখানা স্থাপিত হলো, ঢাকায় সাবানের আর চামড়ার কারখানা স্থাপিত হলো। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় সহরেই দোকান দেখা যাবে যেখানে স্বদেশী বিস্কুট, সিগারেট, গন্ধদ্রব্য, খেলনা, পশমের জিনিষ, জুতো সবই পাওয়া যাবে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক কাগজে স্বদেশী জিনিষের ব্যবসায় বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। স্যার স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্বদেশীআন্দোলনের জন-উৎসাহের বিবরণ কিছু দিয়ে গেছেন, "একবার আবেদনে আঠারো লক্ষ টাকা পাওয়া গেল এবং শ্রীরামপুরের পুরাতন কাপড়ের কল কিনে দেওয়া হলো। এটাকে পরে বাড়ান হলো আর নাম দেওয়া হলো "বঙ্গলক্ষ্মী মিল"। জাতীয় ব্যাঙ্ক" খোলা হলো ভারতের ব্যবসাতে টাকা দেবার জন্যে। পুঁজির অভাব ছিল না কিন্তু সব সময়ে বুদ্ধিজনকভাবে এটাকে খাটান হয়নি। বহু অসফলতা এল আর তাতে স্বদেশী ভাবও সরে গেল। কিন্তু এটা পরে ঘটেছিল। পরে পতন যখন এলো তখন ভারতের পুঁজিবাদ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে।

বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলন যে সময়ে পূর্ণবেগে চলেছে মুসলীম্ লীগের জন্ম হয় সেই সময়ে। প্রকৃতপক্ষে ৩০শে ডিসেম্বর এর প্রথম অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নবাব স্যার সালিমুল্লা বলেছিলেন, "একটা সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে' উঠেছে আর আমাদের

অধিকার আর স্বাধানতা সম্বন্ধেও বিপদ দেখা যাচ্ছে, এ অবস্থায় আমরা সারা ভারতের প্রধান ও জ্ঞানী মুসলমানদের পরামর্শ পাবার জন্যে একত্রিত হয়েছি।" বিপদ কিসের? নিশ্চয়ই বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলন। ধনিবাড়ীর সৈয়দ নবাব আলা চৌধুরী বলেছিলেন "বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্তি কি কি? এথনও অবধি এর যুক্তি ভাবপ্রবণ; যুক্তি হলো এটা বাঙালী হিন্দুজাতিকে বাঙালী মুসলমান জাতি থেকে বিভক্ত করে' ফেলবে।"

করাচীতে লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে একটা প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ঘোষিত হ'য়ে গিয়েছিল যে মুসলমানদের তাদের পাওনা মতো অংশ দিতে হবে। আবার প্রায় সেই সময়েই নবাব ভাইকার-উল-মুলুকের মতো দায়িত্বশীল মুসলমানরা আলিপুর বক্তৃতায় Constitional সরকারের বিরুদ্ধে বললেন এবং ভারতের গনতন্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা দেখিয়ে বললেন যে হিন্দুরাজেরই এটা একটা ছদ্মনাম হবে। আলিগড়ে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বললেন, "সমস্তটাই মরীচিকা, আমাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবার জন্যে একটা চক্রান্ত মাত্র। আমাদের সম্প্রদায়ের ভালো আর সুবিধার জন্যই আমি আমার মনোভাবকে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবো না। যদি আমাদের দেশে নিজেদের সরকার স্থাপিত হয় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি বেশী বেশী ভোট দিয়ে নির্বাচিত হন এবং দেশের আইনসভায় মুসলমানদের স্বার্থ অরক্ষনীয় হয়ে' পড়ে, তবে তার ফল হবে যে নির্বাচনের সব ভালো আর উপকারটা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই একচেটিয়া করে নেবে, আর তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠরা খুব বেশী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

স্বাধীনতার ইতিহাসে সে সব কাহিনী আজ স্মরণীয়। আর বিপ্লবকে অগ্রগতির পথে যাঁরা এনেছিলেন ইতিহাস তৈরীর কাজে তাঁদের দান-ও স্বীকার্য। তারা বহুবার জীবন বিপন্ন করেছেন। এইসব বিপ্লবীরা যে তাঁদের সময়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, আর তার জন্যে তাঁরা কষ্ট আর আত্মত্যাগ করতে কখনও পশ্চাৎপদ হননি।

যেই মুহূর্তে অসহযোগ আন্দোলন শেষ হলো, বাংলার অনুশীলন দল থেকে যুক্তপ্রদেশে একটি বিপ্লবী দল গঠনের জন্য কাশীতে একটি দল এলো।

আর পথে কাশীর স্থায়ীবাসিন্দা শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল যুবকদের মধ্যে গুপ্ত-সংগঠনের কাজ আরম্ভ করলেন। শচীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের পুরাতন বিপ্লবী। তিনি ছিলেন রাসবিহারী বসুর প্রধান সহকারী। কাশী-ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা বলে অভিযুক্ত হওয়ায় তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিলেন। শান্তিপর্বে যেসব বন্দীদের মুক্তিলাভ ঘটেছিল ইনি তাঁদের তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। মুক্তিলাভের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি। সত্যি কথা বলতে কি ইতিমধ্যে তাঁর কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই কোন যোগ ছিল না। সত্যিকার সমস্ত রাজনৈতিক কাজ থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের কেউই ভাবতে পারেননি যে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। যদিও এই বীর ব্যক্তিটির অন্তঃস্থলে আগুন তখনও জ্বলছিল। তিনি তার 'বন্দীজীবন' লিখছিলেন, এটা সাহিত্যে আর ইতিহাসে তাঁর এক মহান্ দান। এর প্রথম ভাগ "নারায়ণে" প্রকাশিত হয়েছিল। এটার সম্পাদনা করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দ্বিতীয় ভাগটা প্রকাশিত হয়েছিল "বঙ্গবাণীতে"। যারা প্রথম ভাগ পড়েছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে শচীন্দ্রনাথের বিপ্লবী-আন্দোলনে ফিরে আসাটা হঠাৎ দুর্ঘটনা নয়। ইতিমধ্যে বিয়ে করে' গার্হস্থজীবনে তিনি প্রবেশ করেছিলেন।

কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদলের পুনরাবির্ভাবের কথা যখন তিনি শুনলেন তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বহুদিন বহুসপ্তাহ তিনি নানারকম চিন্তা করতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আত্মীয়-স্বজনকে উদ্বিগ্ন করে তিনি পায়চারী করতে লাগলেন, ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং শেষে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। সুদূরের আহ্বান তাঁর কানে এলো! তাঁর 'যশোধরা'ও তাঁকে ফেরাতে পারলো না। দেশ তাঁকে চেয়েছে, তিনি আর কোন কিছু না ভেবে বেরিয়ে পড়লেন। এক যুগ আগের শচীন্দ্রনাথ আবার নবোদ্যমে জেগে উঠলেন। আন্দামানবাস আর গভীর পড়াশুনোয় তিনি কয়েকবছর স্থির হ'য়ে ছিলেন এইমাত্র।

সে সময়ে দুজন যুবক অনুশীলনের দূত হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের নাম আজ আমার মনে নেই। অজানা বিপ্লবের প্রতীক ছিল তাঁরা, তাদের নাম কেউ জানতো না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সুদূর পূর্ববাংলা থেকে বিনা পরিচয়ে এই অজানা প্রদেশে বিপ্লবীদল গঠন করতে আসায় তাঁদের কতখানি মনের জোরের দরকার হয়েছিল। সংগঠনের কাজে সফলতা লাভের জন্য যে ভাষাজ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন তাঁরা নোতুন প্রদেশের সেই ভাষা অবধি জানতেন না। কিন্তু রাস্তা আর বাজার ঘুরে তাঁরা শীঘ্রই সেটা শিখে নিলেন। তাদের টাকাও ছিল না, কাশীর ছত্রে বিনা পয়সায় তাঁরা খাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কাশীতে এমন বহু স্থান আছে যেখানের একটা নির্দিষ্ট সংসারে ব্রাহ্মণ আর ভিখারীরা খেতে পান। কোনো রাজা বা বড লোকের নামে এগুলো আছে। তাঁরা ব্রাহ্মণদের খাইয়ে স্বর্গে যাবার পুণ্য অর্জন করেন। এই দুজন নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন এবং খাবারের ব্যবস্থা করে' নিলেন। কিন্তু এসব ছত্রে দুবেলা খাবার পাওয়া যায় না। কেবল মধ্যাহ্নের খাবারই পাওয়া যায়। যাই হোক, বিপ্লবীপার্টির টাকা বাঁচাবার জন্যে এই লোক দুটিকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হতো। একাহারের কষ্ট তাঁরা হাসিমুখেই সহ্য করতেন। কাশীর ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া করে তাঁরা কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁরা ঘরের সামনে বাংলায় লেখা একটা সাইনবোর্ড টাঙালেন "কল্যাণ-আশ্রম"। ক্রমশই কয়েকজন যুবককে দলে টানলেন, এইসব ছেলেগুলির মধ্যে মদনমোহন দাস একজন।

একদিন আমার ভাইএর হাতে 'বন্দীজীবন' বইটা দেখলাম। তৎক্ষণাৎ আমি তার কাছ থেকে বইটি চেয়ে নিলাম। আমি জানতে চাইলাম যে বইটি কোথায় পেয়েছে। কিন্তু সে উত্তর না দিয়ে রহস্যময়ভাবে চুপ করে রইলো। যাই হোক্, বইটি শেষ করে আমি জানতে চাইলাম যে এ রকম বই আরও পাওয়া যাবে কিনা। সে বললে যে পাওয়া যাবে এবং কিছু বই এনেও দেবে। কিন্তু কোথা থেকে এনে দেবে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করলো না। পরদিন সে বললে যে আমার নিজে গিয়ে বই আনাই ভালো হবে! তার কথা মতো আমি গেলাম। জায়গাটি আমাদের গনেশ মহল্লা থেকে মাত্র এক

ফারলং দূরে ছিল। আমার ভাই ছু'ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে যে পাঠাগারটি এঁদেরই। এঁদেরই মধ্যে একজন হাত নাড়তেই সে চলে গেলো। তাঁরা বয়সে আমার চেয়ে প্রায় দশবছরের বড় ছিলেন, তা'বলে বয়সে আমিও কিছু কম ছিলাম না। আমিও অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলাম, আমার প্রবন্ধ বাংলায় বেরুতো, এই সামান্য সাফল্যেই আমার অহংবোধটা খুব প্রবল ছিল। কাজেই এই ভদ্রলোকগুলির পক্ষে আমাকে দলস্থ করা সহজ হয়নি। গান্ধীজী আর অসহযোগ আন্দোলনের কথা আলোচিত হলো। এ সময়ে আমি গান্ধীজীর ওপর আমার সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে একটা ভিন্নপথের কথা উঠবেই। এই লোকগুলি অন্য রাস্তা আমায় বাত্‌লে দিলো। প্রায় পাঁচদিন বা এক সপ্তাহ এই আলোচনা চল্‌লো। অবশেষে আমি বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজী হয়ে গেলাম। ক্রমশঃ আমি আমার মতো যারা মত পরিবর্তন করে' এ-দলে এসেছে তাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাদের মধ্যে শচীন বক্‌সী একজন। আমার চতুর্দিকে যুবকদের একটা দল ছিল। আমি তাদের প্রত্যেককে দলে টানলাম। আমাদের একটা "দুর্জ্জয়" বলে হাতে লেখা বাংলা ম্যাগাজিন ছিল। আমি ছিলাম তার সম্পাদক। "দুর্জ্জয়ের" দলটী সবটাই চলে এলো। রবীন্দ্রমোহন কর ছিলেন এই দলের মধ্যে একজন। এই সময় কল্যাণ আশ্রমের সেই যুবকদুটির স্থানে এলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। সে সময়ে তিনিও অখ্যাতনামা ছিলেন, কেউ তার নাম জানতো না। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাতেই তাঁকে অনেকের চেয়ে আলাদা মনে হলো। বাংলার সেই দুটি অজানা যুবক যাঁরা কাশীতে কল্যাণ-আশ্রম স্থাপিত করেছিলেন আমার কাহিনী থেকে এবার চিরদিনের মতোই চলে' যাচ্ছেন, তাই তাঁদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাই। এটা সত্য যে প্রদেশের কোনো বৈপ্লবিক ইতিহাসই তাঁদের নাম লিখে রাখেনি, আমিও তাঁদের নাম বেমালুম ভুলে গেছি। কিন্তু তাঁরা চমৎকার জাল ছড়িয়ে দিলেন। তাঁরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, যোগেশদা সেইটাই বাড়িয়েছিলেন। তাঁরা অজানাভাবে এসেছিলেন কিন্তু এসে গভীরভাবে তাঁরা শিকড় গেঁথে

রেখে গিয়েছিলেন। এই রকম নীরব কর্মীদের কাজের ওপরই বৈপ্লবী-দলগুলি গড়ে উঠেছে।

যোগেশবাবু ছিলেন সর্বাংশে একজন উপযুক্ত ষড়যন্ত্রকারী বিপ্লবী। যে কাজের ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তিনি সে কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁকে বড় বলে স্বীকার করতে আমাদের কোনোরকম বাধা হয়নি। তাঁকেও আমরা বারবার করে' অনুশীলন ও শচীন স্যান্নালের দুটো দলকে মিলিয়ে ফেলবার জন্য জোর করতাম। আমরা পরে শুনলাম শচীন সান্ন্যালও অন্য উপায়ে এর জন্যে জোর করছিলেন।

শচীন সান্ন্যাল একজন উপযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীই ছিলেন না, ছিলেন পড়াশুনা করা, ছাত্র, নেতা, লেখক আর বক্তা। তিনি শীঘ্রই পার্টিকে একটি নাম, একটি শাসন পরিকল্পনা এবং কার্যপদ্ধতি দিলেন। পার্টির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁর নামই ছিল যোগ্য গ্যারান্টি।

মিলিত হবার অল্পদিন পরেই আমরা পার্টির একটা ছাপা শাসন পরিকল্পনা পেলাম। এটা পাত্‌লা হল্‌দে-কাগজে মুদ্রিত ছিল, কাজেই শেষে এটা "হলদে-কাগজ" নামেই বিখ্যাত হয়েছিল। অবশ্য বৌদ্ধদের অনুসারে এই হলদে রঙটিকে শুদ্ধতাসূচক ভাবা হয়েছিল কিনা জানি না। এই সন্দেহটা অবশ্য একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কেননা সে সময়ে আধ্যাত্মিকতার উপর যত গুরুত্ব দেওয়া হতো তাতে এ কাজটা অসম্ভব নয়। যাই হোক, রঙ-এর রূপক সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা হয়নি। এতদিন অবধি পার্টি ছিল কয়েকজন অজ্ঞাতনামা বিপ্লবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু Constitution এর সঙ্গে সঙ্গে এটার খুবই গুরুত্ব ঘটলো। পার্টির নাম হলো হিন্দুস্থান রিপাব্‌লিক এসোসিয়েসন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত স্বাধীনজাতির একটা Federation গড়ে তোলা। কিন্তু এর সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ছিল অজস্রধারায় সংঘটিত করতে হবে বহু বিপ্লব একটি মূল ষড়যন্ত্রের দ্বারা। তাঁরা অস্ত্র এবং অর্থ সংগ্রহ করবেন, লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ দুই উপায়েই বিপ্লবের ধারণা প্রবেশ করাবেন 'কথা' ও 'ম্যাজিক লণ্ঠন' দ্বারা। অস্ত্র আর অর্থ সংগ্রহ করতে হবে দান গ্রহণ

করে, আবার সময়ে সময়ে জোর জবরদস্তি করে'—নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে'। বহু পরীক্ষার পর সভ্যদের পার্টির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। তাতে অবাঞ্ছিত সভ্য পার্টিতে প্রবেশ করতেই পারতো না। সভ্যরা তাঁদের পার্টির সভ্যত্ব জনসাধারণ আর পুলিশ এই দুই সমাজ থেকেই গোপন রাখতেন। শ্রমিক আর কৃষকদের সংগঠণ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। Constitution এ বলা হলো মন্দ ব্যবহারের জন্যে সভ্যদের হয় পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, নয়তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। প্রত্যেক সভ্যকেই সম্ভব হলে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে। কিন্তু পার্টির অনুমতি বিনা তারা এই অস্ত্রগুলি ব্যবহার করতে পারবে না।

অনুশীলন আর শচীন্দ্রবাবুর দল যুক্ত হযে গিয়েছিল। আসলে শুধু যুক্তই হয়নি যুক্তপ্রদেশে অনুশীলন দল শচীনবাবুর দলের সঙ্গে একেবারেই মিশে গিয়েছিল। অনুশীলনকে শচীনবাবুর দলের সঙ্গে মিলতে হয়েছিল, কারণ বেনারসের বাইরে অনুশীলনের কোনো কাজই ছিল না। তাদের দূতরা হিন্দী অবধি জানতো না, কাজেই বাঙালীপ্রধান কাশীর বাইরে তাদের কাজ এগোয়নি। শচীনবাবুর চেষ্টায় বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদলের একটী কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, অবশ্য তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। শচীনদা (এবার থেকে আমি তাঁকে দাদাই লিখবো, কেননা, এখন থেকে আর দলের বাইরেও সবাই তাঁকে দাদা বলেই ডাকতো) অনায়াসে এই কমিটীকে একেবারে নিজের হাতে এনে ফেলতে পারতেন, তাতে কমিটীর ভালোও হতো। কিন্তু বাংলার দলগুলির শাসনপ্রণালী এমনভাবে গঠিত ছিল যে যতই উপযুক্ত হোক, বাইরের প্রভাব তাতে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। অধিকন্তু ১৯২৪ সালের অক্টোবরে Bengal Ordinance সমস্ত বিপ্লবীদের তাঁদের কার্যক্ষেত্র থেকে এমনভাবে সরিয়ে ফেলেছিল যে এই প্লানটিকে কার্যকরী করবার স্থান ছিল অতি অল্পই।

যুক্তপ্রদেশের (তখনকার উত্তরপ্রদেশ) সংগঠন ও বাংলার প্রেরিত সংগঠন শাখায় এক হয়ে মিলে যাবার পর রাজেন্দ্র লাহিড়ী নামে একজন

কলেজের ছাত্র বেনারস জেলার সংগঠনের ভার পেলেন, আর তিনি H. R. H এর প্রাদেশিক কাউন্সিলে কাশীবিভাগের প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। যোগেশবাবু এই বন্ধুটিকে এমনিভাবেই আমাদের কাছে পরিচিত করে' দিলেন এবং আমাদের তার কাছে থেকে আদেশ নিতে উপদেশ দিলেন। রাজেন্দ্র ছিলেন ভারী মিষ্টি স্বভাবের যুবক। তাঁর আকৃতি ছিল মেয়েদের মতো কোমল, সব সময়েই তাঁর ঠোঁটে হাসি লেগেই থাকতো। তাঁর দিকে একবার চাইলেই মনে হতো জীবনে এর চেয়ে ভালো জিনিষের জন্যই তিনি জন্মেছেন, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ছিল দৃঢ়-সঙ্কল্পের আভাষ, যাতে বোঝা যেত সাধারণের বাইরে অন্যকিছুর জন্যই তাঁর জন্ম। তাঁর এটা খুব বড় বাধা ছিল, এবং এটা তিনি বুঝতেনও। আমাদের কয়েকজন যারা অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ছিল, তারা বাস্তব-রাজনীতি কিছুটা বুঝতো বলে গর্ব করতো। ভারতীয় রাজনীতির হাবভাব আমরা বেশ ভালোভাবেই জানতাম। জাতীয় স্কুল কলেজের ছাত্র হিসাবে আমরা কংগ্রেস-রাজনীতির জোয়ার ভাটা খুব ভাল ভাবেই জানতাম। রাজেন্দ্রবাবু সমসাময়িক রাজনীতির ধারা সম্বন্ধে খুব ভালোভাবেই জানবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন, স্রোতের উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁকে সমসাময়িক রাজনীতিতে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করবার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করতে হতো।

যে দলটি ইতিমধ্যে তার শৈশবাবস্থায় মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে, তার ওপর রাজেন্দ্রবাবুকে জোর করে বসিয়ে শচীনদা ভুল করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে রাজেন্দ্রবাবু একদিন তাঁর সমসাময়িকদের ওপরে উঠবেন, আর তারা সবাই তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই আশা করে তিনি ভুল করেন নি। এর চার বৎসর পরে রাজেন্দ্রবাবুর ফাঁসি হয়।

আমাদের কাজ প্রধানতঃ নয়—সম্পূর্ণভাবেই গোপনীয় ছিল। আমাদের কাজ ছিল উৎসাহী বন্ধুদের নির্দিষ্ট করে' যতক্ষণ না তারা পার্টির সভ্য হয় ততক্ষণ তাদের অনুসরণ করা। এইভাবে আমরা কাজ করতাম। নিয়মানুসারে আমরা খারাপ যুবকদের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। আমাদের বলা ছিল কোনো যুবকের কথাবার্তা শুনে আমরা যেন তাদের সভ্য

না করি। আমরা তাদের পারিবারিক জীবন আর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতাম। যে সব যুবকদের নিকট-আত্মীয় কোনো পুলিশ কর্মচারী আমরা তাদের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম, কেননা, কোন্ ছিদ্রে কোন গুপ্তচর দলে প্রবেশ করবে তার তো স্থির নেই। বিশ্বাসের ওপরই গুপ্তসমিতির অবস্থিতি নির্ভর করে! যদি বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করে তবে জীবনহানিরও আশঙ্কা আছে, এমন ক্ষেত্রেও বন্ধুদেরও ওপর নির্ভর করতে হতো। গোপন সমিতির সমস্ত কাজই খুব সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন করা হতো। সব সময়ে সাবধানে থাকতে হতো। অনেক সময় আশ্চর্য ঘটনা ঘটতোও অনেক। যাকে একেবারে অগ্নিশিখার মতো দীপ্ত মনে হতো তাকেও এক সপ্তাহ পরে হয়তো দেখা যেত জেলে বন্ধুদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। সাধারণ সময়ে সাধারণ আবহাওয়ায় সাধারণ ছেলেরা এমন কি সাধারণের চেয়েও একটু নীচু ছেলেরা বেশ ভালো করেই কাজ করে। কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক অবস্থাতেই অমন পরিস্থিতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়। আর আমাদের পার্টিতে বিপদজনক অবস্থা একটা অসাধারণ ঘটনা নয়, অতি স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল। তাই এই সময়টিতেই আসল মানুষটি বেরিয়ে আসতো। সত্যই সে যেন আলাদা লোক হয়েই বেরিয়ে আসতো। তাতে সে অন্যকেই শুধু আশ্চর্য করতো না, নিজেকেও আশ্চর্য করতো। অবশ্য যাঁরা দুর্বল তাঁরা সময় পেলে নিজেদের শক্ত-সমর্থরূপে প্রকাশ করতেন। তাছাড়া এটা দৃঢ় বিশ্বাস বা conviction এরও প্রশ্ন। প্রত্যেক স্ত্রীলোকই তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গও করতে প্রস্তুত। এইরূপে প্রত্যেক মানুষই যদি তার মা, স্ত্রী বা বোনের প্রতি কেউ অত্যাচার করে তবে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সর্বস্ব পণ করে। কাজেই এর মধ্যে বিস্ময়কর বা রহস্যময়তা কিছুই নেই। মানুষ শিক্ষা বা Instinct দিয়ে অনুভবের যে উচ্চতায় উঠতে পারে এটা হলো মাত্র তাই। Instinct হলো শিক্ষার সেই অংশ যেটা বহু বংশপরম্পরাক্রমে আহরিত হয়।

আমরা যখন গোপনে মিলিত হতাম তখন আমাদের কথাবার্তা মেলামেশা, কলেজ-জীবন, গান্ধীজী ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে নবজীবন লাভ করতো। কিন্তু

যে বিষয়টি আমরা বারবার আলোচনা করতাম সেটা হলো অস্ত্রের বিষয়, ডাকাতি, খুন আর বিক্ষোভ। কোন কোন সময়ে নবপ্রাপ্ত একটা পিস্তল বা রিভলবার আমাদের উৎসাহকে আরও উদ্দীপিত করতো। আমরা এত উৎসাহিত হয়ে উঠতাম যে একটা হুকুম পেলেই আমরা যা কিছু হোক একটা করে আসতে পারতাম। বেনারসের পার্টিতে আগ্নেয়াস্ত্র খুব কম ছিল। কিন্তু ক্রমশই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বাড়তে লাগলো, আর তাদের ঘিরেই আমাদের দুঃসাহসিক কল্পনা পাখা মেলতে লাগলো। দেখে মনে হতো এসব করাতো কিছুই কঠিন নয়। রিভলভার হাতে করার অনুমতি পাওয়াটা একটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় ছিল, অবশ্য, হাতে করা মানে নয় কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোড়বার হুকুম পাওয়া। সেটা প্রশ্নের অতীত ছিল। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল। হাতে দেওয়া মানে ছিল এটা দেখা, গুলি ভরা, বার করা। কার্টিজ না দিয়ে গুলি ছোড়াতেও মাঝে মাঝে জীবন বিপন্ন হতো। পিস্তল কি করে চালাতে হয় না জেনে কয়েকজনের বোকামীতে আমার নিজের জীবনই দুবার সামান্যর জন্য বেঁচে গিয়েছিল। প্রথম বার আমাদের গনেশ মহল্লার বাড়ীতে ব্যাপারটা ঘটেছিল। আমার এক নিকট বন্ধু, আমিই তাকে পার্টিতে এনেছিলাম, আমার কাছে পিস্তলে গুলি পোরা, বার করা ইত্যাদি শিখছিল। পিস্তলে একসঙ্গে দশটা কার্টিজ পোরা যেতো। কমরেডটি আমার সামনে বসেছিলেন। সে তার কাজ করছিল আর আমিও আমার কাজ করছিলাম। হঠাৎ সে খেলার ছলে পিস্তলটা আমার দিকে লক্ষ্য করে বললে—"সাবধান হও, তোমাকে গুলি করবো।" সে বেচারী জানতো বন্দুকটি খালি। আমি কিছু বলবার আগেই সে ট্রিগারটি টেনে দিল আর তার অজানিত-বুলেট বেড়িয়ে এলো। আমাদের দুজনের সৌভাগ্যক্রমেই আমি একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম। আমার পেছনের দেওয়ালে বুলেটটা বিঁধলো। বন্ধুটির হতবুদ্ধিতাটা চিন্তা করুন! সে ভাবলো আমি বুঝি মরেই গেছি। আমি তাকে বললাম যে সৌভাগ্যক্রমে তার গুলি আমার লাগেনি! সে বেচারি একেবারে কেঁদেই ফেললে, তাকে অনেক কষ্টে শেষে থামাই, কিন্তু ভাবপ্রবণতার জন্য নষ্ট করবার সময় তখন ছিল না, বুলেটের

শব্দ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। কাজেই বাইরে বেড়িয়ে দেখতে গেলাম কেউ জানতে পেরেছে কি না। কেউ কোন প্রশ্ন করলো না বা কৌতুহলও প্রকাশ করলো না। ছাদে গিয়ে আশেপাশের লোকেরা ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছে সেটাও একবার দেখে এলাম। দেখলাম কেউই ব্যাপারটায় মনোযোগ দেয়নি। এটা পিস্তল ছিল, রাইফেলের মত এর শব্দ হয়েছিল। কিন্তু ভারতের লোকেরা পিস্তলের শব্দে এতই অনভ্যস্ত যে তারা এদিকে মনোযোগই দেয়নি। আমি নিশ্চিত হলাম, আর বন্ধুটিকে পিস্তল কার্টিজ সমেত কয়েকদিনের মতো চলে যেতে বললাম। সেও আনন্দের সঙ্গেই তাই করলো। এরপরে আরও একবার আমি এইভাবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম। এবার অবশ্য আবহাওয়াটা একটু আলাদা ছিল। বন্ধুরা একজন কমরেডের বাড়ীতে একত্রিত হয়েছিলেন একটা ডাকাতির জন্য। অবশ্য শেষ অবধি এই বিশেষ ডাকাতিটি কার্য্যকরী হয়নি। এই ব্যাপারে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ছিলেন। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি, কেননা কয়েক বছর বাদে যতীন দাস আমরণ অনশন করে যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখন, গান্ধীজী বহুদিন নিঃশব্দ থাকার পর বিবৃতি দিয়েছিলেন, যে যতীন্দ্রনাথ দাস অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ঐভাবে তিলে তিলে প্রাণ দিতে পেরেছিলেন। তিনি এইরকম বিবৃতি দেবার সুযোগ পেলেন এই কারণে, যে, সে সময়ে লাহোর-মামলা চলছিল আর কোর্টে তাঁর বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ হয়নি। গান্ধীজী এই বিবৃতি দিয়ে জানতে চাইলেন যে অহিংসায় যাদের আস্থা নেই, তারা এরকম বীরের মতো তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে, আত্মোৎসর্গ করতে—পারে কি না? যাক সে কথা। ডাকাতির জন্যে আমরা যতীন্দ্রনাথ সহ জনৈক বন্ধু-গৃহে একত্র হয়েছি, রিভলভার, পিস্তল আর রাইফেল প্রয়োজনীয় সংখ্যায় আনা হয়েছে, তাতে তেল লাগিয়ে ঘরে রাখা হয়েছিল। পণ্ডিত রামপ্রসাদের মতো লোক অস্ত্র পরিদর্শন করছেন, যন্ত্রপাতি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা দেখছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় আমরা দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। রিভলভারটা থেকে হঠাৎ গুলি বার হয়ে গেল। ট্রিগারটা আমার দিকে থাকায় পণ্ডিত

ভাবলেন আমারই বুঝি গুলি লাগলো। আমি বললাম যে আমার গুলি লাগেনি। কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। তিনি বললেন, গুলি লাগলে আহত বুঝতেই পারে না যে তার লেগেছে। পরের মুহূর্তে যখন তিনি আমার পেছনের দেওয়ালে একটা গর্ত দেখতে পেলেন তখনই তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমায় গুলি লাগেনি।

আগের পরিচ্ছেদে আমি কাশীর মধ্যের কাজের কথাই আলোচনা করেছি। কিন্তু কাশীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের বিভিন্নস্থানেও দলের কাজ চলছিল। প্রদেশের বিভিন্নস্থানে আমাদের দূতেরা কাজ করছিল। শচীনদা যখন দলকে পুনর্গঠন করতে চাইলেন তখন তিনি প্রথমে পুরাতন বিপ্লবীদের কাছেই অগ্রসর হলেন। এইভাবে সুরেশ ভট্টাচার্যের কাছে এগোনো হলো। কাশী-ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি শচীনদার সহকর্মী ছিলেন। কাজেই ডাকা মাত্রই তিনি এলেন। তিনি কানপুরে হিন্দু "প্রতাপের" সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে তাঁকে ঘিরে একদল নামকরা বিপ্লবীদল গড়ে উঠলো। যে হিন্দী জ্ঞানের সাহায্যে করবাবু লক্ষ্ণৌ-এ বিদ্রোহের আগুন জ্বালতে চেয়েছিলেন তাঁর পরিমাণ বিশেষ ভালো ছিলনা। আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন করবাবুর সংশোধিত হিন্দী সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। ঠাকুর রোশান সিং-এর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রোশান সিং-এর দুই স্ত্রী ছিলেন, একজন বিবাহিতা, আর একজন অ-বিবাহিতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রায় সবাই জানতাম। রোশান সিং দেখা করে আসবার পর আমরা সবাই জিজ্ঞাসা করতাম যে তাঁর পরিবারের সব কেমন আছেন? গোবিন্দবাবু তাঁকে খুশী করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমারি রাণ্ডী অয়ি?" এর হিন্দী মানে হল, "তোমার রক্ষিতা এসেছেন?" কিন্তু করবাবু ভাবলেন যে তাঁর স্ত্রী এসেছেন কিনা এ কথাই তিনি জিজ্ঞেস করছেন। করবাবু কি করে রাণ্ডী মানে স্ত্রীলোক ভাবলেন তার একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। আন্দামানে থাকার সময়ে মেয়েদের ব্যারাককে বন্দীরা "রাণ্ডী ব্যারাক" বলতো। যেসব inmateরা

এই ব্যাপারে উৎসাহিত হতেন না এবং তাদের তৃপ্ত করতেন না, তাদের প্রতি প্রতিশোধ নেবার বাসনায় বন্দীরা তাঁদের ঐ নামে ডাকতেন। তাছাড়া তাঁরা এও জানতেন যে, যে সব মেয়েরা ধরা পড়ে তারা সাধারণতই খারাপ চরিত্রের হয়। করবাবু এসব কিছুই জানতেন না। ইংরাজিতে এই ব্যারাককে 'স্ত্রীলোকদের ব্যারাক' বলে, কিন্তু হিন্দীতে বলা হতো 'রাণ্ডী ব্যারাক', কাজেই বেচারি করবাবু ভাবতেন যে রাণ্ডী মানেই বুঝি স্ত্রীলোক। অবস্থা দেখলে তাঁর এই সিদ্ধান্তে আশা বিশেষ কিছু আশ্চর্য নয়। তাতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত বছর তিনি এ ভুলটা করে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'রাণ্ডী' কথাটা ব্যবহার করেন নি, করেছিলেন 'রিণ্ডী' শুধু মানেটাই তিনি বুঝেননি, এটাকে বাংলা রূপও দিয়েছিলেন। কাজেই ঠাকুর রোশান সিংকে যখন করবাবু জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার রিণ্ডী এসেছিলেন?' তখন রোশন সিং একেবারে হিংস্র হয়ে উঠলেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে করবাবু বোধ হয় তাঁর অ-বিবাহিত স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন। এদিকে করবাবু ভাবলেন যে রোশন সিং মিছামিছি কেন এত রাগ করছেন। কিন্তু অন্যদের কাছে একথা বলতেই তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে গোলমালটা কোথায় বেধেছে। তখন করবাবুও বুঝিয়ে দিলেন যে রিণ্ডী মানে যে স্ত্রীলোক একথা তিনি কোথায় জেনেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক হযেছিল। ঠাকুর রোশন সিংকে একথা বলা হলে তিনিও ব্যাখ্যায সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তিনি ভারী আমোদপ্রিয ছিলেন। অবশ্য রসিকতাগুলো একটু অমার্জিত ছিল। তাই তিনি করবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার মা আপনার বাবার 'রিণ্ডী' আর আপনি তাহলে "রিণ্ডীর ছেলেই"! সবাই হেসে উঠলো। কিছুদিন পরে অবশ্য তিনি এসব কথা ভুলে গেলেন।

এই ভাষা সম্বল করে করবাবু লক্ষ্ণৌ-এ গিযেছিলেন। যাই হোক, লক্ষ্ণৌ-এ তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করেন নি। অন্যদিক দিযেও তিনি দলের কাজ খুব কমই করতে পেরেছিলেন। এ-সময়ে এও বলা উচিত যে তাঁর চরিত্র খুবই দৃঢ় ছিল। তাঁর শরীরের মধ্যে grape shot ছিল, আমাদের অনুপ্রেরনা দিত।

এরপর আমি প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ একজনের পরিচয় দেবো, যার তুল্য আত্মত্যাগ আর আত্মোৎসর্গ বিপ্লবীদলেও বড় একটা দেখা যায়নি। তাঁর নাম মুকুন্দিলালজী। মেনপুরী-ষড়যন্ত্র মামলায় তিনিই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি শান্তিপর্বেও ছাড়া পাননি। ১৯২৩ সালের শেষে বা ১৯২৪ সালের প্রথমে তিনি মুক্তি পান। একসময়ে মুকুন্দিলালজী খুব বড়লোক ছিলেন, তাঁর বাবা তাঁর জন্যে প্রচুর অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত গেন্দা-লালের সহকর্মী হিসাবে বিপ্লবীদলকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। ফলে তিনি দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন যে তাঁর বড় ভাই শুধু তাঁর সম্পত্তি নয় তাঁর স্ত্রীকেও দখল করে নিয়েছে। যে উদ্দেশ্যের পেছুনে মুকুন্দিলালাজী চলেছিলেন তাঁর ভাই বা স্ত্রী কেউই তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। কাজেই তাঁকে তারা যে ঠকালো তাতে আশ্চর্য হ'বার কিছুই নেই। তাঁর ভাই-এর ঔরসে তাঁর স্ত্রীর একটী সন্তান জন্মাল। কিন্তু গুণধর ভাইটি শিশুটিকে হত্যা করলেন। বাড়ীর একটী ঘরের মেঝেতে শিশুটিকে পুঁতে ফেলা হলো। শেষ অবধি পুলিশ খবরটি জানতে পারলো, সম্ভবতঃ যে সব বিশ্বাসী লোকরা মেঝে খুঁড়ে শিশুটিকে পুতেছিল তাদেরই মধ্যে একজন পুলিশকে খবর দেয়। কাজেই ঘটনাস্থলে পুলিশ দেখা দিল। মুকুন্দিলালজীর অযোগ্য ভাই চট্ করে বুঝলেন ব্যাপারটির গুরুত্ব। তিনি বুঝলেন যে অন্ততঃ দশটি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তাঁর ভাগ্যে নাচ্ছে। তাই তিনি পুলিশকে একটা মোটারকম টাকা ধরিয়ে দিলেন।

ছাড়া পেয়ে মুকুন্দিলালজী গ্রামবাসিদের কাছ থেকে সমস্ত খবর পেলেন। বুঝতেই পারা যার যে কতটা আঘাত তিনি এ খবরে পেলেন। তাঁর কাজকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তখন দেশের লোকের ছিল না, আর তাঁর পরিবার তো তাঁকে ঠকালোই রীতিমত। তাঁর স্ত্রীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, তাকে তিনি সমস্ত সত্যঘটনা বলতে বললেন। স্ত্রী বহু অশ্রুপাত করে তাঁকে সমস্ত নিষ্ঠুর সত্য খুলে বললেন। অবশ্য সে তার ভাসুরের ঘাড়েই সব দোষটা চাপালো। সে প্রমান করতে ব্যস্ত হলো যে তার ভাসুরই জোর করে এই সব করেছে। অবিশ্বাস করবার মতো গল্প এটা নয়। এরকম সব গল্পে

এই ব্যাপারই ঘটে থাকে। পুরুষ চিরদিনই এড়িয়ে যায়, আর স্ত্রীলোকের ব্যাপারটার সব ভার গ্রহন করা ছাড়া আর কোনোরকম পথ থাকে না। স্ত্রীকে অনুশোচনা করতে দেখে মুকুন্দিলালজী তাকে ক্ষমা করলেন। আর তার পরে তিনি কাশীতে ফিরে গেলেন। অবশ্য তাঁর বড় ভাইকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। বহুদিন অবধি ঘটনাটি মনে পড়লেই তাকে গুলি করবার তাঁর অদম্য ইচ্ছা হতো। এই জন্য তিনি বহুদিন একটা রিভলভারের খোঁজও করছিলেন। পণ্ডিত রামের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ায় তিনি তাঁর কাছে একটা রিভলভার ধার চেয়েছিলেন। এইজন্যে কিন্তু তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। শেষ অবধি মুকুন্দিলালজী এ মতলব ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবীকাজে আবার মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন।

পার্টির টাকার প্রয়োজন ছিল। সংগঠনের জন্য টাকার দরকার ছিল। সর্বসময়ের কর্মী লেনিন যাদের professional revolutionary বলেছেন, পার্টির কাজে তাঁদের দরকার ছিল, তাদের পার্টি থেকে খাওয়ানো হতো, পার্টিকেই তাঁদের খরচ যোগাতে হতো। আমাদের সময়ে সর্বসময়ের কর্মীদের পার্টি পুরোপুরি খেতে দিতেও পারতো না। এই ব্যাপারে প্রতাপগড়ের কমরেড কুন্দালালের কথা আমার মনে পড়ছে। কাশীর water worksএ তিনি ভালো কাজ করতেন। তিনি প্রতাপগড়ের বাসিন্দা ছিলেন। কাজেই প্রতাপগড়ে তাঁকে পার্টির সংগঠনের কাজে পাঠান হলো। তিনি কাশীর কাজ ছাড়লেন। পার্টি থেকে তাঁকে মাত্র মাসিক দশ টাকা করে' দিতে হতো। যে সুখস্বাচ্ছন্দ তাঁর স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার সবটাই তাঁকে বিসর্জন দিতে হলো। যোগেশবাবু আর করবাবুর বেলায়ও এই ব্যাপার ঘটেছিল। আমার মনে আছে যোগেশবাবু নিজে রান্না করে' রান্নার বাসন কোসন নিজে পরিস্কার করতেন। চন্দ্রশেখর আজাদকে তো রীতিমতো উপোষ করতে হতো। বহুসময়ে আমি আবিষ্কার করেছি, যে তিনি উপবাস করে আছেন। আমি তাঁকে বাড়ীতে এনে খাওয়াতাম। শচীন বক্সীও তাঁর জেলার বাইরে কাজ করবার সময় অতি অল্প টাকা পেতেন। রবীন্দ্রমোহন

করকে তো ঘোড়ার দানা খেতে হতো। মুকুন্দিলালজী কষ্টে সৃষ্টে খাওয়াটা যোগাড় করতেন। আমাদের মতো যে সব সৌভাগ্যবানদের বিপ্লবীকাজে যোগ দিয়েও বাড়ী ছাড়তে হয়নি তাদেরই অবস্থা একটু ভালো ছিল। সমস্ত আন্দোলনের ঝক্কি পড়তো রবীন্দ্রের মতো লোকের ওপর যাদের বাড়ী ছাড়তে হয়েছিল। রবীন্দ্রের পরবর্তী ইতিহাস খুব রোমাঞ্চকর।

সর্বসময়ের কর্মীরাও যেখানে পেতো সেখানেই খেতো। প্রনবেশের একজন শিক্ষকের দরকার ছিল। তার পরিবার ঐ জন্যে দশ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজী ছিল। আমি যোগেশবাবুর জন্যে ঐ কাজটা ঠিক্ করলাম। প্রণবেশ ইতিমধ্যেই পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার শিক্ষক যে কে সে তা জানতে পারেনি। যোগেশবাবু প্রণবেশের কাছে তার আসল পরিচয় দিতে মানা করেছিলেন। একজন দুঃস্থ বেকার বলে আমি তাঁর পরিচয় দিযেছিলাম। অবশ্য ক্রমশঃ প্রণবেশ একথা জানতে পারলো। লক্ষ্ণৌএ থাকাকালীন শচীন বক্সীও শিক্ষকতা করে' কিছু রোজগার করতেন। চন্দ্রশেখর একজন জাতীযতাবাদী আচার-মোরব্বা বিক্রেতার কাছে হিসাবনবীশের কাজ করতেন। আর অন্যান্য সবাইও এই ভাবেই কোনও না কোন উপায়ে জীবিকানির্বাহ করতেন। সে সব সভ্যরা বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, কেউ বা তাঁর চাক্‌রী আর বাড়ী দুই-ই ছেড়েছিলেন, অন্য জায়গায় কাজ করবার জন্য তাঁরা কখনও পার্টির ওপর ভারস্বরূপ হ'তে চাননি। সে যুগে পার্টির নামে অর্থ উপার্জন করা চলতো না।

Professional revolutionary-দের খাওয়াপরা ছাড়াও পার্টিকে তাঁদের এখানে ওখানে যাওয়ার সব খরচ বহন করতে হতো। এ খরচটা বিশেষ কম ছিলনা, কেননা খবরাখবর সবই দূতের মারফৎ দিতে হতো, পোস্টঅফিসকে বিশ্বাস করা যেতো না। তার উপরে ইস্তাহার ছাপার খরচ ছিল, অস্ত্রশস্ত্রের খরচ ছিল। সভ্যরা সাধ্যমত চাঁদা দিত, কিন্তু সভ্যরা যে-হেতু ছাত্র ছিল, সেইজন্য তারা অতি অল্পই দিতে পারতো। যে চাঁদা উঠ্‌তো তাতে সভ্যসংগ্রহ কাজে যে বইএর দরকার হতো, সে বই কিনতেই তা খরচ হয়ে যেতো। অবশ্য আরও দরদী বন্ধু ছিলেন যাঁরা প্রচুর অর্থ দিতেন। কাশীর

শিবপ্রসাদ গুপ্ত শচীনদা গেলে পাঁচশত টাকা অবধি দিতেন। এইরকম বা এর চেয়ে কম টাকা প্রায়ই পাওয়া যেত। কিন্তু এই সমস্ত করেও পার্টির খরচ চালান যেতো না। সে জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জোর করে 'দান-গ্রহণে'র পন্থা বার করতে হলো।

কিন্তু এই পন্থা গ্রহণের পূর্বে পার্টিকে গভীরভাবে ভাবতে হলো। কেননা এ পন্থাগ্রহণ মানেই শান্তিপূর্বক সংগঠনের কাজ ছেড়ে পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ করতে হবে। প্রথমে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে হবে যে জোর করে দান আদায়ের মানে কি। এই জোর করে দান আদায় ভারতীয় বিপ্লবীদের আবিষ্কার নয়। আয়র্ল্যাণ্ডে একই অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। আর ঐতিহাসিকের লেখাতে দেখা যায় যে লেনিনের বলশেভিক পার্টি জোর করে' টাকা আদায় করে পার্টির আর্থিক চাহিদা মেটাতেন। এমন অনেক কাহিনী জানতে পারা যায় যে কোথাও স্টালিনও এই ব্যাপারে একবার ধরা পড়েন। এমন কি মিঃ ক্রসিন, যিনি পরে বৃটেনে রাশিয়ার দূত হয়ে এসেছিলেন, তিনিও একবার এইরকম ব্যাপারে ধরা পড়েন। স্টালিনের ট্রট্স্কি-পন্থী জীবনকার Mr. Sauversine (আমি তাঁকে ট্রট্স্কি-পন্থী জীবনীকার বললাম, কারণ তিনি যদিও স্টালিনের জীবনী লিখবেন বলেছিলেন, তবুও স্টালিনের জীবনী লিখতে বসে বারবার তাকে ট্রট্স্কির সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে ট্রট্স্কির তুলনায় স্টালিন নিকৃষ্ট।) তিনি তাঁর বইএর বহু পরিচ্ছেদে বিশেষ করে এই কথা দেখাতে চেয়েছেন, যে লেনিনের বহু ঘাগী আর দেশপ্রেমিক ডাকাতের সঙ্গে আলাপ ছিল স্টালিনের। একথাটা যে কতদূর সত্য সেটা ভাববার কথা। কেননা কোনো সরকারী ঐতিহাসিক এবিষয়ে কিছু লেখেননি। অবশ্য একটা ডাকাতিতে স্টালিনের সংযোগকে কেউই অস্বীকার করেননি। সম্ভবতঃ পার্টির ইতিহাসের এই দিকটা লোকসমক্ষে প্রকাশ করার বিশেষ কোনো কারণ ঘটেনি বলেই এ দিকটা বিশেষ প্রকাশ করা হয়নি।

জোর করে 'দান' আদায় করার মানে হলো ধনীলোকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা। ধনীলোকেরা সাধারণতঃ পার্টির অর্থভাণ্ডারে কিছু সাহায্য করতে চান না। পার্টি কিন্তু তাঁদের টাকা

চায়। এদিকে জানা কথাই যে তাঁরা স্বইচ্ছায় পার্টিতে কিছু দেবেন না। কাজেই জোর করে 'দান' নিতে হবে, অর্থাৎ টাকা আদায় করতে হবে। অনেকে হয়তো বলবেন যে এটা 'দান' নয়, সোজা বাংলায় 'ডাকাতি' ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আমি নিজেও জোর করে' টাকা আদায় করাটা বিশেষ পছন্দ করতাম না। মনে হতো বাস্তব থেকে অনেকটা সরে গেছি। সে যাই হ'ক, 'দান' কথাটার একটা ক্রুটী আছে। যেটা জোর করে নেওয়া হয় সেটাকে 'দান' (contribution) বলা চলে না। যাই হোক্ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান্ এসোসিয়েশনের শাসন পরিকল্পনায় লেখা আছে পার্টির টাকার অভাব হলে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। কাজেই অর্থের সত্যি অনটন ঘটলে তাঁরা শেষ অবধি এই পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। আমাদের আগে রুশ ও আয়র্ল্যাণ্ডে এই একই উদ্দেশ্যে একই পন্থা অনুসৃত হয়েছিল, এই ছিল আমাদের হৃদয়বলের উৎস।

কিন্তু সত্যকথা বলতে কি আমি এরকম অভিযানের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আমাকে সর্বদা বলা হতো যে আমাকে বেসামরিক বিভাগে, মানে প্রচার ও সংগঠনের কাজে, কাজ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাকে যখন জোর করে 'দান' গ্রহণের কাজে ডাকা হলো তখন অবশ্য আমি আশ্চর্য হলাম না। কেননা আমি বুঝতাম যে theory অনুসারে যাই হোক বাস্তবক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগই এক হয়ে যেতে বাধ্য। মুলভাবে দুটো বিভাগকে পৃথক রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আসল সময়ে দেখা গেল যে এই পার্থক্য মিথ্যাই রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তিকে সংগঠনের কাজ করতে হবে সেই ব্যক্তিকেই দরকার হলে জোর করে 'দান' গ্রহণকারী ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

প্রথমবারে আমি আর রবীন্দ্রই কাশীর পার্টি থেকে জোর করে 'দান'-গ্রহণের পার্টিতে স্থান পেলাম। আমাদের একথা বলা মাত্রেই আমরা নিজেদের ভেতর যেন উৎসাহের শিহরণ অনুভব করলাম! আমরা ভাবলাম মরবার জন্যেই বুঝি আমাদের বাছা। আমাদের দু'দিনের নোটিশ দেওয়া হলো। আমরা ব্যবস্থা করতে লাগলাম। যে রাত্রে খাগায় নেমে পড়তে হবে সে রাত্রের আগের

রাত্রে আমরা সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করলাম। সিনেমা দেখা মানে শেষোক্ত রাত্রিটি আরও সহজভাবে গ্রহণ করা ও দুটি রাত্রির মধ্যে একটা contrast সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। এটা যে একেবারে ছেলেমানুষী খেয়াল ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এটাই তখন মনে হয়েছিল স্বাভাবিক। এসময় আমি নিজেকে বাংলার একজন উদীয়মান লেখক বলে মনে করতাম। আমার হিন্দী সাহিত্যের ওপর লেখাগুলো পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত "সাহিত্য" ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় বেরুতো। কয়েকটা লেখা অর্ধলিখিত অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত বাক্সে ছিল। সেগুলোকে চট করে' শেষ করে' তাদের গন্তব্যস্থানে পাঠিয়ে দিলাম।

আমাদের সেই কৌতুকের ব্যাপারে ফেরা যাক। যিনি জোর করে 'দান' গ্রহণকারী পার্টিকে আবার নেতৃত্ব দিতেন তাঁকে পরমহংসদেব বলা হতো। হিন্দু আধ্যাত্মিকের ভাষায় তার মানে হলো যার কিছুতেই আসক্তি নেই। আমাদের মধ্যে একমাত্র পরমহংস ছিলেন পণ্ডিত রামপ্রসাদ। পরমহংসের পরেই আসতেন অবধূত। অবধূত তাঁদের বলা হত যাঁরা জোর করে চাঁদা আদায় কার্যে বেশ হাত পাকিয়ে ফেলেছেন, তবে এখনও কোন ডাকাতিতে নেতৃত্ব করবার সুযোগ পাননি। পণ্ডিত রাম গ্রেপ্তার হলে "অবধূতদের" মাঝ থেকেই নতুন পরমহংস বেরুতেন। কিন্তু সে রকম কিছু না ঘটায় তিনি একমেব-দ্বিতীয়ম্ রয়ে গেলেন। আত্মগোপনকারী ফেরার আসামীদের বলা হতো জীবন-মুক্ত, মানে বেঁচে থেকেও যে মুক্ত, বেঁচে থেকেও যাঁর আত্মা মুক্ত, অর্থাৎ তিনি যে-কোনো সময়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে পারেন।

ঐ সময়ে আমাদের মধ্যে জীবনমুক্ত ছিলেন গোবিন্দচরণ কর। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁর পেছনে ঘুরছিল। আমাদের ভাষায় যে শহীদ হয়েছে সেই-ই ছিল মুক্ত। এইভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষা গড়ে' নিয়েছিলাম। আধ্যাত্মবাদিদের ভাষা আমাদের কাছে নতুন অর্থ পেত। আরম্ভে এটা গ্রহণ করা হয়েছিল পূর্ব-সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যে। যদিও যারা জোর করে 'দান' গ্রহণকারী পার্টিতে যোগ দিতেন তাঁদের অভিযানের কাহিনী লোককে বলে বেড়াতে মানা করা হতো, তবুও সাধারণ লোকে

তা'দের কথা বলতো। কাজেই যদি দু'জনের কথাবার্তায় 'ডাকাতি' কথাটা বারবার ব্যবহার করা হতো, তবে যারা কথা বলেছে তাদের আর পার্টির তাতে অনিষ্ট ঘটতো। কিন্তু যদি এই কথার বদলে "জ্ঞান" কথাটা ব্যবহার করা হতো তবে এত সহজে এটা বোঝা যেত না। কাজেই প্রয়োজনের খাতিরেও এই শব্দগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছিল। 'জ্ঞান' মানে হল ডাকাতি, যে ডাকাতি করেছে সে হল 'জ্ঞানী'। বাকীরা যারা কেবল দলের সদস্য, তারা রয়ে গেল 'ভক্ত' অর্থাৎ তারা ভক্তি করছে, জ্ঞান হতে বাকী।

*

এখন কয়েকটা জোর করে 'দান' গ্রহণকারী অভিযানের কথা বলবো। অবশ্য প্রয়োজনমতো নাম লুকিয়ে যাবো। প্রথমে যারা কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় লিপ্ত ছিলেন, সেই জোর করে' 'দান' গ্রহণ করার কথা বলবো যাতে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। পিলিভিড জেলার বিচঃপুরী বলে একটা গাঁ আছে। এটাই হলো পার্টির একেবারে প্রথম ডাকাতিগুলোর মধ্যে একটা। আমার মনে হয় এইটাই হলো প্রথম ব্যাপার যখম পণ্ডিত রামপ্রসাদ পেশাদার ডাকাতদের জোর করে 'দান' গ্রহণকারী দলের সাহায্যের জন্যে ডেকেছিলেন। ঘটনাটির প্রকৃতি ছিল অর্ধেক জোর করে 'দান' গ্রহণ আর অর্ধেক সাধারণ ডাকাতি—অংশীদারী হিসাব যা ছিল তারই সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলবো। যারাই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করে তাদের সাধারণতঃ সমান অংশ থাকে লুটের মালে। এমন কি সর্দারও একটি অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এটাই সব নয়। ডাকাতদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের একটা আভিজাত্য আছে। সাধারণতঃ ডাকাতরা একটা অংশই পায় কিন্তু রাইফেল বা বন্দুক আনতে পারলে সে পায় দুটো অংশ, একটা তাব জন্যে আর একটা আগ্নেয়াস্ত্রটির জন্যে, এটাই হলো ভারতীয় ডাকাতদের সর্বজনীন বিধান, অন্য দেশের কথা আমি জানি না।

এই পেশাদার ডাকাতরা এলো অংশীদার হিসাবে। তারা দেখতে ছিল খাঁটি অপরাধীর মতো। তাদের কথাবার্তা ছিল অশ্লীল আর অমার্জিত। কেন যে পণ্ডিত রামপ্রসাদ তাদের এনেছিলেন তার কারণ অজানা নয়। তিনি

ভেবেছিলেন যে আমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র, আমাদের দিয়ে বোধ হয় বিশেষ কাজ হবে না। কাজেই তিনি এই সব পেশাদার ডাকাতদের আনালেন। আমাদের উপদেশ দিলেন যে এদের ওপর যেন কোনোরকম অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করি। তিনি ভয় করেছিলেন যে তাঁদের প্রতি আমরা বোধ হয় বিশেষ বন্ধুতাপূর্ণ হব না। আমাদের মধ্যে পার্থক্য গভীর। শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে আমরা বিশেষ মিশতে পারলাম না। আমাদেরও তারা অবজ্ঞার সঙ্গে দেখতে লাগলো, আর পণ্ডিত রামপ্রসাদের কাছে সন্দেহ জানাতে লাগলো যে আমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে কিনা, আর আমরা কার্যক্ষেত্রে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়বো কি না। আমরা সাফল্যসহকারে ফেরা না অবধি পণ্ডিত রামপ্রসাদ আমাদের কাছে তাদের সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তারা আমাদের শিশু মনে করত, আর আমরা তাদের অপরাধী বলে ধারণা করতান। পণ্ডিত রামপ্রসাদের ঐক্য-প্রতিভাই তাদের সঙ্গে আমাদের এক করতে পেরেছিল।

যদিও আমরা অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও তাদের উপস্থিতি আমাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। পরে যে বিপদ এসেছিল তার সঙ্গে এই মনোভাবের সংযোগ কতটা ছিল বলতে পারি না। এই ব্যাপারে একজন পেশাদার ডাকাত আমাদের পথ প্রদর্শক ছিল, মানে সে আমাদেয় গাঁয়ের পথ দেখাচ্ছিল। আমরা গাঁয়ের বাইরে পৌছিয়ে তাকে খবর নিতে যখন পাঠালাম তখন খুবই দেরী হয়ে গেছে, মহাজনেরও দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ীটা খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। আর আমাদের এও বলা হলো যে এটা একেবারেই অসম্ভব, এই অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক যে আমাদের ফিরে যেতে হ'বে। কিন্তু শুধু হাতে ফিরে যাওয়া ডাকাতের রীতি নয়। কাজেই পথ-পরিদর্শকের মনে পড়লো যে কাছেই একটা গাঁয়ে এক মহাজন আছে, যার বাড়ী লুটের উপযুক্ত। রামপ্রসাদ তাকে জায়গাটির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন এবং শুনে আশ্বস্ত হলেন যে গাঁ'টার অবস্থান বিপদজনক নয়। অন্য ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে পথ-পরিদর্শকের হাতের মুঠোয় ছিলেন। পথ-প্রদর্শক বললে যে লোকটী জমিদার, কাজেই তার কাছে যে প্রচুর নগদ অর্থ থাকবে তা অবধারিত।

কাজেই খবরটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো যে আমাদের অন্য একটী গাঁয়ের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত লোক বুঝতেই পারলো না যে আসল প্ল্যানটা বদলে ফেলে তার বদলে নতুন প্ল্যান গ্রহণ করা হলো। সমস্ত ব্যাপারটার খুঁটিনাটির দেখবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমরা একটা নিঃসম্বল লোকের বাড়িতে ঢুকলাম আর বহু খোঁজাখুঁজি করেও একটা পয়সা পাওয়া গেল না। পথ-প্রদর্শক অবশ্য বললে যে নগদ টাকা প্রচুরই আছে খালি খুঁজে নেবার ওয়াস্তা। কাজেই আর একবার আমরা বাড়িটা খুঁজে দেখলাম। যেখানে যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখা সম্ভব, সবই খুঁজে দেখা হলো। এজন্য বহুস্থানের মেঝে খোঁড়া হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই। বাড়ীর মালিককে সব উপায়েই গালাগালি দেওয়া আর ভয় দেখান হলো। কিন্তু সে কোনো জায়গাই দেখিয়ে দিলো না। পেশাদার ডাকাত খবর আদায়ের জন্যে ঐ লোকটির আঙুল পুড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করলো। কিন্তু পণ্ডিত রামপ্রসাদ ভয় দেখান ছাড়া আর কিছুতেই রাজী হলেন না। বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কয়েকটা গহনা ছিল। কিন্তু সেগুলো রূপোর, সোনার নয়। পণ্ডিত রামপ্রসাদ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। বাধা একদম না পাওয়ায় তিনি বারবার ভেতরে এসে দেখছিলেন যে কাজকর্ম কি রকম এগোচ্ছে, কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর হচ্ছিল না।

আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকও বুঝতে পারছিল যে বাড়ীর কর্তার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। ডাকাতরা স্ত্রীলোকদের সমস্ত গহনাগাটি সংগ্রহ করলো। যাত্রার সংকেত দেবার আগেই পণ্ডিত রামপ্রসাদ একবার বাড়িতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু মোটা নগদ টাকার বদলে রূপোর গহনা দেখে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে পথ-প্রদর্শক আমাদের জমিদারের বাড়িতে আনেনি, এনেছে এমন একজনের বাড়িতে যার সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে যে সংবাদদাতা বলে যে অমুক অমুক লোকের আশী হাজার বা একলাখ টাকা আছে প্রায়ই তার কথা ঠিক হতো না।…যা করা

হয়েছে তা' আর ফেরানো যায় না। পণ্ডিত রামপ্রসাদ রূপোর গহনার স্তূপের কাছে গেলেন এবং হুকুম দিলেন যে এগুলো নিয়ে কোনো দরকার নেই। কাজেই এগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ডাকাতদের মধ্যে যে গহনার ভার নিয়েছিল সে আমাদের সামনেই দু'চারটে গহনা পকেটযাত করে নিল। পণ্ডিত রামপ্রসাদ এটা দেখেও না দেখার ভান করলেন। তা'ছাড়া আর তিনি কিই বা করতে পারেন। একমাত্র করতে পারতেন পিস্তলের নলটা তার বুকে বসিয়ে গহনাগুলো ফিরিয়ে নেওয়া। কিন্তু একথা তখন ছিল অচিন্ত্যনীয়। আমাদের নিরাপদে ফিরে যেতে হবে, শুধু তাই নয়, আমাদের এও দেখতে হবে যে পেশাদার ডাকাতদের হৃদয় যাতে আহত না হয়। কেননা, যদি মনে আঘাত নিয়ে আমাদের দলে থেকে যায় তবে সে পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলে দিতে পারে। তবে একটা বিষয় আমি স্থির যে যদি কেউ বাড়ির স্ত্রীলোকদের ওপর অত্যাচার করতো তবে পণ্ডিত রামপ্রসাদ তাকে পিস্তল দেখাতে বা গুলি করতে বিন্দুমাত্র দেরী করতেন না। এক্ষেত্রে তিনি আমাদের আর ডাকাতদের মধ্যে গৃহবিবাদের ঝুঁকিও নিতেন। অবশ্য আমাদের উপস্থিতিতে আর আমাদের শুনিয়ে তিনি ডাকাতদের সতর্ক করে দিলেন যে কেউ স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করলে তিনি তক্ষুনী তাকে গুলি করবেন। ডাকাতরা বুঝলো যে এগুলো শূন্যগর্ভ ভীতি-প্রদর্শন মাত্র নয়। তাই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের প্রতি তাদের ব্যবহার মোটের ওপর খারাপ ছিল না।

কাজেই এই ব্যাপারে আমরা কোনো মাল না নিয়ে বরং একজনকে খুন করেই ফিরলাম। এসময়ে আমরা জানতাম না যে একটা খুন হয়ে গেছে। এর বহু পরে পুলিশ যখন আমাদের এই ডাকাতির দায়ে ধরলো মাত্র তখুনি আমি এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারলাম। জানতে পারলাম যে একটা ভীড় প্রথমেই বাড়িটিকে রক্ষা করতে আসায় ভীড় সরাবার জন্যে গুলি ছোঁড়া হয় এবং তাতে একজন লোক মারা যায়। পথ-প্রদর্শককে যতই দোষ দেওয়া হোক ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে রামপ্রসাদ বা বিপ্লবীদল যে পথপ্রদর্শক টাকার লালসা মেটাতে না পেরে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের লালসা চরিতার্থ করতে গিয়েছিল তার খপ্পরে পড়ে কিছু তো পেলোই না, অধিকন্তু একজন

নির্দোষের মৃত্যুর কারণ হলো। এই ব্যাপারে আমরা সবাই একবিষয়ে একমত হলাম যে ভবিষ্যতে আর পেশাদার ডাকাতদের কখনও ডাকা হবে না। পণ্ডিত রামপ্রসাদও বুঝলেন যে তাদের ছাড়াই তিনি কিছু করতে পারবেন। অবশ্য গ্রাম থেকে ফেরবার পর আমরা শুনেছিলাম যে ডাকাতরা বলছে যে এই গান্ধীজীর চেলাদের মানে আমাদের যতটা ক্ষীণ ও আনাড়ী তারা ভেবেছিল ততটা আনাড়ী তারা নয়। তারা তাদের মতোই পূরোদস্তুর ডাকাত।

জোর করে 'দান' গ্রহণকারীদের অন্য অভিযানে বিপ্লবীদলের নিয়মিত সভ্যরাই যোগ দিতেন। আরও দু'চারটে ঘটনা বর্ণনা করা যাক। পিলিভিত জেলার বনরৌলী গ্রামে একবার আমাদের পার্টি খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছিল। যখন আমরা এক শয়তান মহাজন আর জমিদারের বাড়ির পাঁচিল ডিঙোলাম তখন হঠাৎ গ্রামবাসীদের দিক থেকে গুলি চলতে আরম্ভ হলো। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের কারুরই তাতে আঘাত লাগলো না। দুটো বিভিন্ন বন্দুক আমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হলো। যারা বাড়ীর মধ্যে দ্রুত লোহার সিন্দুক ভাঙছিলেন তাঁদের ভয়ের কিছুই ছিলনা। তাঁরা তাঁদের কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু যাঁরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা তাঁদের পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়লেন। যে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ করছিল আমি তাদের মধ্যে যোগাযোগ সংযোগের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমি শুনলাম গুলি দেওয়ালে এসে বিঁধছে। ছাদের মানুষদের অবস্থা দেখবার জন্যে আমি ছাদে উঠলাম। পণ্ডিত রামপ্রসাদ ছাদে ছিলেন। অন্য লোকটিকে আমার স্মরণ হচ্ছে না। খুব বিপদজনক মুহূর্ত। এরজন্যে দরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা। সৌভাগ্যের বিষয় রাতটি ছিল অন্ধকার। অবশ্য এ সৌভাগ্য আমরাই হিসাব করে অর্জন করতাম, অন্ধকার রাত বেছেই আমরা অভিযানে বার হতাম।

এটা নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে লড়াই ছিল না। তাদের অস্ত্র ছিল, আর সে অস্ত্রের ব্যবহারও তারা করেছিলো। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ পণ্ডিত খুব খুশী হলেন।

ছাদের ওপর তাঁর সহকর্মীকে তিনি গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করলেন। বললেন গুলি সঞ্চয় করে রাখতে। তিনি বুঝে-সুঝে নিজে গুলি চালাচ্ছিলেন। তিনি খালি গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব লক্ষ্য করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বন্দুকগুলোর মধ্যে একটা থেমে গেল। পণ্ডিত সেই দিকই লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। কিন্তু কোন উত্তর এলো না। পণ্ডিত বললেন যে "বোকাটার টোটা ফুরিয়ে গেছে।" কিন্তু অন্য লোকটি গুলি চালাতে লাগলো। অবশ্য এ সময়ে বুঝে-সুঝে হুঁসিয়ার হয়ে তারা গুলি খরচ করছিলো। এটা খুবই বিপদজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই। যাই হোক, বাড়ীর মধ্যের কাজ শেষ হলো। যতদূর আশা করা গিয়েছিলো ততদূর না হোক কিছু পাওয়া গেল। কিন্তু কী করে এগুলো নিয়ে যাওয়া যায়। বাড়ি থেকে চুরি করে পালানো সহজ। আর তাতে বন্দুকধারীকে এড়ানও যায়। বাড়িটা গ্রামের বাইরে অবস্থিত বলে এই ফন্দীটা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল। এটা আবার বিপদজনক এই জন্য যে, শত শত লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেখানে। তাই যত লুকিয়েই আমরা বেরুই না কেন, একেবারে অদেখা ভাবে আমরা বেরুতে পারবো না। কেউ না কেউ আমাদের পালাতে দেখবেই আর সে তৎক্ষণাৎ সঙ্কেত দেবে, সমস্ত গ্রাম আমাদের ওপর এসে পড়বে, বন্দুকধারিরাও তা'দের বন্দুক নিয়ে এসে পৌঁছাবে। বন্দুকধারীকে থামাতে অসমর্থ হয়ে আমরা এক উপায় গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত রামপ্রসাদ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। সেই সঙ্গে ছাদের উপরের লোক আর গ্রামের লোকদের মধ্যে বন্দুকের যুদ্ধ চলতেই লাগলো।

বন্দুক যে ছুঁড়ছিল পণ্ডিত রোশন সিং তা'কে জানতেন। সে ছিল একজন প্রত্যাবৃত সৈনিক। এই খবরই তার হাত থেকে রক্ষা পাবার পক্ষে, এড়ান পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি সহসা শায়িত অবস্থা ত্যাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং চেঁচিয়ে বন্দুকধারীকে ডেকে বললেন যে, কাপুরুষের মতো আড়ালে লুকিয়ে না থেকে সে সামনে এগিয়ে আসুক, তারপর দেখা যাক কার লক্ষ্য ভালো। এই ব্যাপারে বিপদও খুব ছিল। তা' ছাড়া পণ্ডিত দাঁড়িয়ে

ছিলেন ছাদের ওপরে কাজেই একজন রাইফেলধারীর পক্ষে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁকে গুলি করা খুবই সহজ ছিল।

আমরা ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলাম। ফল হয়তো আমাদের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের দ্যোতক হতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে পণ্ডিত প্রসাদের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মাঠে এসে পড়তে পারে। বাস্তবিক এই সম্ভাবনাই প্রচুর ছিল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে এই সব বিচ্ছিন্ন চিন্তা আমার মাথার মধ্যে খেলে গেল। কিন্তু সে সময়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করারও উপায় ছিল না। সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ঘটনা স্রোত এগিয়ে যেতে লাগলো। পণ্ডিতের বারবার বিরোধের আহ্বানে লোকটি তার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলো, আর বাড়ী থেকে মাত্র দু'শো গজ দূরে দাঁড়ালো। গাঁয়ের সাহসী লোকটি এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। পণ্ডিতের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। যে কোনো সময়ে সে ট্রিগার টিপতে পারে। আমাদের পক্ষে ভীতিকর মুহূর্ত। অবশ্য ইতিমধ্যে ছাদের অপর লোকটি লক্ষ্য ঠিক করছিলেন; কিন্তু তিনি পণ্ডিতকে জানতেন। তিনি গুলি করছিলেন না। আসলে পণ্ডিত গ্রামের বীর পুরুষটির তুলনায় খুবই দ্রুত ছিলেন, ছাদের লোকটির তুলনাতেও তাই ছিলেন। তিনি ট্রিগার টানলেন, আলো জলে উঠলো, একটা শব্দ হলো, তারপর সব চুপচাপ। অন্যদিকের লোকটি খুবই আঘাত পেয়েছিলো। হাত থেকে তার রাইফেল পড়ে গেল, চীৎকার করে উঠলো। গ্রামবাসীরা, যারা আমাদেরই মতো যুদ্ধটা লক্ষ্য করছিল তারা আর্তনাদ করে উঠলো, আর আমরা বুঝলাম যে যুদ্ধ খতম হলো। পণ্ডিত যে ভালো লক্ষ্যকারী আর কৌশলকারী তা বোঝা গেল। গ্রামবাসীরা বুঝলো যে খেলা শেষ হ'লো, আর আমরাও বুঝলাম যে আমরা বিপদমুক্ত হলাম। এর পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা 'দান' নিয়ে অর্থাৎ টাকা নিয়ে প্রত্যাগত হলাম। এই 'দানের' টাকা "বিপ্লবী" নামক ইস্তাহার যেটা রেঙ্গুন থেকে পেশোয়ার অবধি ছড়ান হয়েছিল, তার দাম বাবদ চলে গেল।

অন্য একবার, আমি জেলার নাম বলবো না, জোর করে 'দান' গ্রহণকারী

পার্টির অন্য এক রকম দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এখানে যখন পার্টি গ্রামে পৌঁছিল, তখনও গ্রামবাসীরা জেগেছিল, আর বাড়ীর বাইরে আসা-যাওয়া করছিল। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম আমাদের তারা জিজ্ঞেস করলো যে আমরা কে, আমরা বললাম যে আমরা বাইরের লোক, আমরা গ্রাম্য মহাজনের বাড়ীর অতিথি। আমরা মহাজনের নাম বললাম কেন না তার টাকা আনতেই যাচ্ছিলাম। এতে গ্রামবাসীরা চুপ করে গেলেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মাত্র আটজন। গ্রামের লোকেরা আমাদের সংখ্যা গণনা করে নিশ্চিন্তভাবে বললে যে এত কম লোক ডাকাতির দল গড়তে পারে না। কাজেই তাদের সন্দেহ উদ্রক্ত হলো না। তারা আগ্নেয়াস্ত্রও লক্ষ্য করলো না। কেননা সেগুলো ভালো করেই লুকানো ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে ঢুকে তারপর নিজ মূর্তিতে বেরিয়ে আসবো। মহাজনের বাড়ী পৌঁছে দরজা ভাঙবার পরই তারা বুঝতে পারলো যে কি উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হলো রাইফেল ছুঁড়ে, এটা ছিল কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ।

ঘটনার পুরোপুরি বিবরণ দেবো না। তার দরকারও হবে না। আমি শুধু তার বিশেষত্বগুলো বর্ণনা করবো; শুধু দেখাবো যে অন্য সব ঘটনা থেকে এটা আলাদা কোথায়? গ্রামবাসীরা রকম-সকম দেখেই বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা কি। তারা আমাদের গুণেছে, তারা আমাদের দেখেছে আমাদের কারুর চেহারা অসাধারণ নয়। আর তাদের বিবেচনা অনুসারে আমাদের অস্ত্রসস্ত্রও নেই। তবুও তারা বন্দুকের শব্দ শুনেছে, তাই তারা এটাকে ফটকার শব্দ বলে মনে করলো। এতে তারা দ্বিগুণ বল পেল এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের দিকে ধাবমান হলো। সাধারণতঃ যেমন থাকেন পণ্ডিত রামপ্রসাদ প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার আর ছাদের ওপর নয়, একেবারে নীচের তলায়, বাড়ীর সামনে। গ্রামবাসীরা পাশের রাস্তা দিয়ে এলো, এবং তৎক্ষণাৎ পণ্ডিত আর তাঁর রাইফেলকে ছড়ি দিয়ে তারা আঘাত করলো। তাদের আঘাতে পণ্ডিত হয়তো পড়েও যেতেন, যদি না শচীন্দ্রনাথ বক্সী সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে অটোমেটিক রিভলবার দিয়ে তাদের ওপর না লাফিয়ে

পড়তেন। বাস্তবিকই তাঁর সাহসে সমস্ত দলটাই বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে পণ্ডিতও উঠে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে কি ঘটেছিল, তখনও জানা যায়নি। আমাদের ওপর হুকুম ছিল স্ত্রীলোকদের ওপর অত্যাচার না করার। আমরা তাদের শান্ত-ভাবে বসতে বলতাম। এবারেও তাই হলো। কিন্তু দুজন স্ত্রীলোক, একজনের বয়স হ'বে প্রায় ত্রিশ বা বত্রিশ (আমার বা আমাদের প্রায় মায়ের বয়সী) আর একটি অল্প বয়সী স্ত্রীলোক আমাদের আঘাত করতে চাইলো। আমরা তাদের ভয় দেখিয়ে থামাতে গেলাম, তাতেও তারা থামল না। আমার রিভলভার দেখালাম। কিন্তু তাতেও না। তারা হঠাৎ আমাদের দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা আমাদের রিভলভার চেপে ধরলো এত জোরে যে আমরা ভাবলাম, এবার বুঝি হেরেই গেলাম। এমন একটা অদ্ভুত অবস্থা হলো, তারা আমাদের রিভলভার ধরে রয়েছে, আমাদের মারছেও সেই সঙ্গে। আমরা একেবারে অসহায়, কি করতে পারি আমরা? তাদের মারার বদলে আমরা তো আর তাদের মারতে পারি না। কিন্তু তাই বলে রিভলভার তো ছেড়েও দিতে পারি না। আমি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে আমার রিভলভারটা কেড়ে নিলাম! কিন্তু আজাদের রিভলভারটা তারা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। আজাদ তাঁর স্বল্পজীবনের শেষের দিকে যেমন শক্তিশালী হয়েছিল, সে সময়ে তেমন শক্তিশালী ছিল না। স্ত্রীলোকটী রিভলভারটা টেনে নিয়েই পালিয়ে গেল। আজাদ ভারী বিচলিত হয়ে পড়লো, কিন্তু আমি তখন কি করতে পারি? আমি তো গুলি করতে পারি না! রিভলভারটা কেড়ে নেবার জন্যে যে বল প্রয়োগের দরকার তা-ও করতে পারি না। রাগে আজাদ পাগল হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোক তার রিভলভার কেড়ে নিয়েছে, দেখে তার পৌরুষ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সে রাগে আর অপমানে জ্ঞান হারিয়ে আমার রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে অনুসরণ করতে চাইলো। ইতিমধ্যে পালাবার সঙ্কেতধ্বনি হলো, আর আমরাও চলে এলাম। চন্দ্রশেখর ক্যাপ্টেন রামপ্রসাদের কাছে তার রিভলভারটা যে একজন স্ত্রীলোক কেড়ে নিয়েছে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে চাইলো, সেই মুহূর্তে যখন গ্রামবাসীরা পলায়নকে অবধারিত বলে মেনে নিয়েছে, তখন আর তার কথা শোনা হলো না, আর,

আমরাও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ফিরে এলাম। পণ্ডিত রামপ্রসাদ সম্মুখভাগে রাইফেল নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ওপর ছিল সংগৃহীত অর্থের ভার।

গ্রামবাসীরা আমাদের পালাতে দেখে সব দিক থেকে বিশেষ করে' সম্মুখ থেকে আমাদের আক্রমণ করলো। ঢিল আর জলন্ত আগুন আমাদের দিকে ছোঁড়া হলো। আমাদের লাগলো বটে কিন্তু আহত কেউ হলো না। প্রায় শ' দুয়েক গ্রামবাসী ছোরা, কুঠার, লাঠি, ছড়ি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আক্রমণ করলো কিন্তু তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। আমাদের এ একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা। আগে কখনও আমাদের কেউ সাহস করে ধাওয়া করেনি। আমাদের গ্রামে প্রবেশের সময় তারা আমাদের গুণেছিল বলেই তারা বর্তমানে এমন সাহস করতে পারলো বলেই আমার বিশ্বাস। তারা গুণে দেখেছিল যে আমাদের সংখ্যা এমন কিছু বেশী নয় এবং তারা ভেবেছিল যে আমাদের কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যে রিভলভারটা আজাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেটাকে তারা কাঠের খেলনা ভেবেছিল, কেননা আজাদ শেষ অবধি এতে করে গুলি ছোঁড়েনি। আমরা এই অনুসরণে চিন্তিত হলাম না কেননা গ্রামের সীমান্তে আসা মাত্র আমরা লক্ষ্য করলাম যে গ্রামবাসীদের সংখ্যা কমছে। সমস্ত ব্যাপারটাই ভালোভাবে করা হলো কেননা এখন শুধু সময়ের প্রশ্ন। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা বিপদ ঘটলো। রাজেন্দ্র লাহিড়ী হঠাৎ সমস্ত মাল সমেত একটা নালায় পড়ে গেলেন। আমরা থামলাম, কিন্তু এ সময়ে আমরা বিপদে পড়েছি দেখে গ্রামবাসীরা তাদের গতি দ্বিগুণ করে দিয়ে আমাদের প্রায় ওপরে এসে পড়লো। রাজেন্দ্রবাবু আবার নালায় ফিরে যেতে চাইলেন; কেননা মালটা তাড়াতাড়িতে তিনি সেখানে ফেলে এসেছিলেন। নষ্ট করবার সময় ছিল না, তাই ক্যাপ্টেন নালায় নামবার হুকুম দিলেন না। গ্রামবাসীরা দেখলো যে মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন আমরা প্রাণভয়ে ছুটছি। এতে তারা খুবই সাহস পেল। এবার তারা এত কাছে এগিয়ে এলো যে হাতাহাতি যুদ্ধে তারা তাদের বিভিন্ন অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে। পণ্ডিত রামপ্রসাদ তাদের ভয় দেখাবার জন্যে দু'একটা গুলি ছুঁড়লেন কিন্তু কেউ আহত

না হওয়ায় এতে তারা আরও রেগে গেল মাত্র। ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত। অবশ্য নালার কাছে তাদের সংখ্যা খুবই কমে এলো। কয়েকজন মালটা তুলে নিল আর বাকীরা ভাবলো যে আর অনুসরণ করা বৃথা। কিন্তু কয়েকজন আমাদের শেষ অবধি অনুসরণ করবার মনস্থ করলো। এ সময়ে আমরা আর একটা গাঁয়ের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। তারা অনুসরণকারী গ্রামবাসীদের চীৎকার শুনে লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে বেড়িয়ে এলো এবং কয়েকজন আমাদের দিকেও এগিয়ে এলো। কাজেই ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। যে গ্রামগুলো আমাদের পার হতে হবে যদি তার থেকে প্রত্যেকবার নতুন অনুসরণ-কারীরা এসে এদের দলে যোগ দেয় তবে তো একেবারে গেছি। পণ্ডিত রামপ্রসাদ বাস্তববাদীদের মত ব্যাপারটারে অনুশীলন করে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বললেন। যখন অনুসরণকারীরা চল্লিশ-পঞ্চাশ গজের মধ্যে তখন তিনি আমাদের থামতে বললেন। তিনি লক্ষ্য স্থির করে ভিড়ের মধ্যে দু'বার গুলি করলেন তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে একটা লোক পড়ে গেল এবং অনুসরণও তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তারা বুঝলো যে আমাদের কাছে সত্যিই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। দু'চারজন ছাড়া ছাড়া ভাবে আমাদের অনুসরণ করলো কিন্তু শীঘ্রই তারা হতাশভাবে ছেড়ে দিল। বীর গ্রামবাসীদের চীৎকার দূরে পড়ে রইলো। আর আমরা শীঘ্রই রাতের নিঃস্তব্ধতার মধ্যে আত্মগোপন করে গেলাম। এই অভিযানটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দুর্ভাগ্যসূচক। এতে আমরা পেলাম না কিছুই, বরং একটা রিভলভার খোয়া গেল। এতে পার্টি গভীর ভাবে চিন্তা করলো এবং ঠিক করলো যে গ্রাম্য-ডাকাতী আর করা হবে না। কিন্তু এই বিবরণ শেষ করবার আগে একটা ঘটনা বলবো যেখানে সম্পূর্ণ নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

আমরা সবাই এতে পুলিশের মতো পোষাক পড়েছিলাম। পণ্ডিত রাম খুব ফর্সা ছিলেন তাই তিনি ইংরাজ পুলিশ পরিদর্শক হলেন। কাশীর যে লোকটির শিখের মত লম্বা দাড়ী তাকে সাব-ইনস্পেকটার করা হলো। বাড়ীর দরজা খোলবার জন্যে এই সবের প্রয়োজন হয়েছিল। ছলনা করা হলো যেন

পুলিশের দল এসেছে বাড়ী খানাতল্লাস করতে। প্রায় শেষ মুহূর্ত অবধিও তারা আমাদের ছদ্মবেশ সন্দেহ করেনি। আমরা যখন গ্রামের বাইরে এলাম তখনই তাদের সন্দেহ হলো যে আমরা বোধহয় আসল পুলিশ নই।

এই প্রসঙ্গে এখানে আমাদের একজন মহৎ সহকর্মীর কথা কিছু বলে নিই। তিনি রবীন্দ্রমোহন কর, পাঠকের কাছে আগেই তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর জীবন যোদ্ধার-গৌরবে মহিমান্বিত। সকল দিকেই তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে এমন কি অসুখের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে তাঁকে হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যুদ্ধ চলছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন জন্ম-যোদ্ধা—যুদ্ধই ছিল তার সবচেয়ে কাম্য। জীবনের সমাপ্তিও হলো এই বিরোধিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। পুরাতন বিপ্লবীর মধ্যে যা যা ভালো গুণ ছিল তাঁর মধ্যে সেগুলোর প্রত্যেকটাই দেখা যেত। তিনি ছিলেন নির্বাক যোদ্ধা, অনুশোচনা তিনি কখনও কিছুর জন্য করেননি, সহ্যশক্তি ছিল তাঁর অসীম। শক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি, কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন পরম নির্ভীক যোদ্ধা।

রবীন্দ্র তাঁর ভাই-এর কথায় দৃকপাত না করে তাঁর বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে লাগলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল বিপ্লবী-সাহিত্যের প্রচার আর পার্টিতে সভ্য নির্বাচন করা। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। আবার মাঝে মাঝে তাঁকে জোর করে 'দান' গ্রহণকারী দলেও যোগ দিতে ডাকা হতো। আমি আগেই বলেছি কি ভাবে আমি এবং তিনি প্রথম জোর করে 'দান' গ্রহণকারীর দল গঠন করি। বিপ্লবী-সাহিত্য প্রচারের সময় হঠাৎ পুলিশ তাঁকে চিহ্নিত করে ফেলে। তাঁরা তাঁকে ধরবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে পড়লো, তাঁর দাদা তাঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন; অবশেষে একদিন তিনি প্রকাশ করলেন যে চিরদিনের মতোই তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। পার্টির টাকা থাকলে বহু আগেই পার্টি তাঁকে এভাবে থাকবার জন্যে টাকা দিত। কিন্তু এতদিন অবধি পার্টি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। এবার রবীন্দ্র পার্টির কাছে সাহায্য দাবী করায় পার্টি তাঁর ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে তিনি একটা ঘরেই অধিষ্ঠিত হলেন পরে অবশ্য একটা খুব সস্তা হোটেল

রেখে তিনি উঠে গেলেন। হোটেলটি ছিল দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে। প্রতি মাসে খরচ হতো তাঁর দশ টাকা। হোটেলটি একজন যৌবন-উত্তীর্ণা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হতো, রবীন্দ্র বলতেন যে তার রান্না খুব সুন্দর।

যখন ভারতের সর্বত্র "বিপ্লব" ছড়ান হচ্ছিল, তখন এ কাজে রবীন্দ্র কাশীতে খুব ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিপদের ঝুঁকি নিতেন এবং খুব অসাধারণ জায়গাতেও ইস্তাহার খাটিয়ে দিয়ে আসতেন। এ সমস্তই রাতে করা হতো। রবীন্দ্র ছাড়াও অনেকে এই ইস্তাহার বিলি করতেন, কিন্তু তিনিই সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন। ভোরবেলা যখন কাশীর রাস্তায় রাস্তায় ইস্তাহারের চারিদিকে লোক জমে যেত তখন কাশীর পুলিশ রাগে জ্বলতো। কাশীতে এই সব ইস্তাহার এত বেশী ছড়ানটা তারা তাদের সম্মানের হানিকর বলে ভাবতো। তাদের ধরবার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তারা হোটেলে রবীন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলো, তার ঘর খানাতল্লাস করা হলো কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

পুলিশের খোঁজ আরম্ভ হয়ে গেল। রবীন্দ্রকে জেলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু তারা তাঁর কাছ থেকে পেলো না কিছুই। সাধারণ বিচারাধীনের মতো তাঁর সঙ্গে জেলে ব্যবহার করা হলো। ইঙ্গ ব্রিটিশ জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীতে আর সাধারণ বন্দীতে কিছু তফাৎ করা হয় নি। রবীন্দ্রের গ্রেপ্তারে হোটেলের কর্ত্রী খুব ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজের মনের মতো একটি কারণও খুঁজে নিল। সে ভাবলো রবীন্দ্র বুঝি কারুর মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিল। এবার সব ব্যাপারটা তার কাছে সহজ হয়ে এলো। রবীন্দ্র কোলকাতার বড় লোকের ছেলে অন্য একজন বড়লোকের মেয়ে নিয়ে পালিয়ে কাশীতে এসেছে। সন্দেহ এড়াবার জন্যে তারা আলাদা আলাদা বাস করছিল। এখন কোন রকমে ধরা পড়েছে। পুলিশ রবীন্দ্রের সঙ্গী সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই বলতে পারলো না। একবার আমি কর্ত্রীর রান্না সম্বন্ধে রবীন্দ্রের গর্ব যাচাই করবার জন্যে হোটেলে গিয়েছিলাম। অবশ্য আমার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল যে আমি কোলকাতার বাবু কাশী দেখতে এসেছি। একথায় সে বললে যে রবীন্দ্র যদি কোন মেয়ের কাছে যেতো তবে সে মেয়েটি হোটেল-

কর্ত্রী মা ছাড়া আর কেউ নয়। (রবীন্দ্রের পক্ষে এটা খুব লোভের ব্যাপার নয়, কারণ কর্ত্রীরই বয়স ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ-এর ওপর)। পুলিশ কর্মচারীটি তার কাছ থেকে অনেক খবরের আশা করছিল, কিন্তু না পেয়ে সে ভারি রেগে গিয়ে তাকে গালাগালি করতে লাগলো—অবশ্য একথাও সে বুঝলো যে কর্ত্রী সব সত্যি কথাই বলেছে। তবুও রাগ দেখিয়ে সে বলতে লাগলো যে হোটেলকর্ত্রী বোমার দলের সঙ্গে যোগ রাখায় তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। এ থেকেই কর্ত্রী সব ব্যাপারটা জানলো। সে অবাক হয়ে গেলেও নিজেকে রক্ষা করবার প্রয়োজন বোধ করলো আর সে জন্যে রবীন্দ্রকে গালাগাল দিতে লাগলো, "যদি একবার জানতাম যে মুখপোড়া এইসব দলে আছে তবে এক লহমাও দেরী না করে ব্যাটার বিষ ঝেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিতাম। হায়, হায়! লোক চিনি বলে সব গর্ব আমার গেল! ঐ হতভাগা আমাকে কিনা শেষে বোকা বানাল! হা ভগবান, আমি কিনা ভাবতাম ছোঁড়া একটা মেয়ের পেছনে ঘোরে?" কাজেই পুলিশ কর্মচারী তাকে না ধরে চলে গেল।

পোস্টার সাঁটার জন্য রবীন্দ্রকে অভিযুক্ত করা হলো কিন্তু দু'একজন সাক্ষীর জন্যে মামলাটি সফল হলো না। তাই তিনি ছাড়া পেলেন কিন্তু ১০৯ ধারা (ভ্যাগাবণ্ড হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্যে) অনুসারে তিনি ধরা পড়লেন আর এক বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ড অথবা দশ টাকা জামিন শাস্তি হলো। পার্টি দু'জন লোককে জামিন দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে ছাড়তে রাজী হলো না। কাজেই জামিনে তিনি খালাস পেলেন না।

এরপরে আমি যখন ধরা পড়লাম তিনি তখনও কাশীজেলা জেলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দিতো না। ছাড়া পাবার পর তিনি ভাবলেন যে তাঁর ওপর একটা বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। সে দায়িত্ব হলো পার্টিকে চালাবার দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আসফাকউল্লা, চন্দ্রশেখর বা অন্য সব গোপনকারীর সঙ্গে মিলতে পারলেন না। কাজেই তিনি নিজের পথে একলাই চলতে লাগলেন। কি করে বোমা তৈরি হয় তা শেখবার জন্যে তিনি কোলকাতা যাত্রা করলেন। কোলকাতায় ক'বছর থেকে

তিনি বোমা তৈরি শিখলেন। কিন্তু সংযুক্ত প্রদেশে ফেরবার মুখে তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় একটা ঘরে ধরা পড়লেন। তাঁর সঙ্গে আর একটি যুবকও ধরা পড়লো। বোঝা গেল সম্প্রতি তারা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কি করে নন্দবংশ ধ্বংস করেছিলেন তার সম্বন্ধে কোন বই পড়ছিলেন। কাজেই কোর্টে জবানবন্দী দেবার সময় তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত আর চাণক্যের কথা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা ঠিক যে কি বলেছিলেন আমার আজ তা মনে নেই। তাঁদের প্রত্যেকের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। এই সময় জেলে রবীন্দ্রের জীবন প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা একটানা যুদ্ধ ছিল। বৎসরের পর বৎসর কম খাওয়া আর বেশী কাজে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। আর যদিও তখন তিনি সন্দেহ করেননি কিন্তু বোধ হয় তখনই তাঁর ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হয়।

পূর্ণ শাস্তিভোগের পর যখন তিনি ছাড়া পেলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে বটে কিন্তু মন তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে চাইলো না। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাংলার ডাক্তার ছিলেন। ছাড়া পাবার পর তাঁর নিমন্ত্রণে তিনি তাঁর কাছে গেলেন আর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে প্রায় দুমাস সেখানে রইলেনও। তাঁর স্বাস্থ্যটা খানিকটা ফিরলে পর তাঁর বড় ভাই তাঁকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চাইলেন। রবীন্দ্র বুঝলেন যাবার পালা আবার সুরু হলো। একদিন তিনি দাদাকে স্পষ্টই বললেন যে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে ফেলেছেন। তিনি কাশীতে ফিরেও গেলেন। এখানে একটী বিরাট সমস্যা যেন সমাধানের জন্য পড়েছিল। এটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়। প্রকৃত পক্ষে সে সময়ে কাশীতে বিপ্লবীদল বলে কিছু ছিলো না। সব পুরাতন কর্মীরা হয় ধরা পড়েছেন, নয়তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। রবীন্দ্র আবার এই পার্টিকে বাঁচাতে চাইলেন, আর অবিলম্বে তাকে কার্যকরীও করতে চাইলেন। কিন্তু আর একটি সমস্যার সমাধান সেই সময়ে আরও জরুরী হয়ে পড়লো।

তাঁর এক প্রতিবেশীর কন্যা জনৈক যুবকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটির দেহে সন্তানের আবির্ভাব হওয়ায় ব্যাপারটি চারিদিকে জানাজানি হয়ে পড়ল। মেয়েটির পরিবারের পক্ষে এটা চরম অসম্মানকর ব্যাপার হয়ে উঠলো।

রবীন্দ্র কাশীতে এসেই খবরটা পেলেন। তিনি মেয়েটির প্রেমিক ছেলেটির কাছে গিয়ে ছেলেটিকে জোর করলেন মেয়েটিকে বিয়ে করে তাকে চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে। তিনি বললেন যে মেয়েটিকে সে বিয়ে না করলে মেয়েটির বাবা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। আর তাহলে দুটো উপায় মেয়েটির সামনে খোলা থাকে—হয় আত্মহত্যা করা, নয়তো পতিতা রমণীর জীবন গ্রহণ করা। কিন্তু তাতেও দুরাত্মাকে টলানো গেল না। সে বলতে আরম্ভ করলো যে বিয়ের ব্যাপারে সে স্বাধীন নয়। কাজেই তার মা বাবার অনুমতি নিতে হবে। রবীন্দ্র ব্যাপারটাকে এখানেই থামতে দিলেন না। তিনি ছেলেটির মা বাবাকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা সম্মতি দিলেন না বরঞ্চ তাদের ছেলের নামে এ কলঙ্ক আনায় তাঁরা খুবই বিরক্ত হলেন আর পাছে দুর্বল মুহূর্তে পুত্র বিয়ে করে ফেলে তাই তাড়াতাড়ি তাকে বাংলায় বায়ু পরিবর্তনের নামে পাঠিয়ে ;দিলেন।

ইতিমধ্যে মেয়েটির বাবা অধৈর্য হয়ে পড়লেন। সমাজের চাপ তাঁর ওপর এত বেশী ছিল যে বাধ্য হয়ে তাঁকে একদিন মেয়েকে পথে বার করে' দিতে হলো। এবার রবীন্দ্রের সামনে একটা বড় প্রশ্ন এলো। তিনি ভাবলেন যে তাঁর বিপ্লবী মনোবৃত্তির পক্ষে এ যুদ্ধকে গ্রহণ করে মেয়েটিকে চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত। মেয়েটিকে তিনি আশ্রয় দিলেন। মেয়েটি তাঁকে শিশুকাল থেকে জানতো, কাকা বলতো তাঁকে। তাঁর স্বভাবমতো তিনি ফলাফলের ওপর লক্ষ্য না রেখেই ঘটনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর ভাইঝিকে আশ্রয় দিয়ে তিনি ফলাফলের কথা ভেবেও দেখলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ এর ফলাফল তিনি বুঝতে পারলেন। যে সমাজ মেয়েটিকে তার বলি বলে গ্রহণ করেছিল, মুখের গ্রাস সরে যেতে দেখে সে হিংস্র হয়ে উঠলো। মেয়েটিকে তিনি যে রক্ষা করলেন এতে কৃতজ্ঞ না হয়ে কিংবা তিনি যে এবার দুটো মানুষের অর্থ অর্জনের ভার গ্রহণ করলেন এতে দয়াপরবশ না হয়ে সমাজ তাকে সবদিক দিয়েই আক্রমণ করলো। রবীন্দ্র এই সব বিদ্রূপকে অবহেলা করবার মতো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনিও এবার বুঝলেন যে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে তিনি এবার

মেয়েটির প্রেমিকের পদ গ্রহণ করলেন। নিন্দার স্রোত আরও প্রবল হলো, তাঁকে গালাগালি দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিপ্লবীদলকেও টেনে আনতো। লোকে এও বলতে লাগলো যে তিনি নাকি মেয়েটির আসল প্রেমিক, মেয়েটির গর্ভে যে শিশুটি বাড়ছে তার পিতা হলো রবীন্দ্র। রবীন্দ্রমোহন বীরের মত দাঁড়ালেন এই নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রমোহনের কাশীবাস প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। অবশেষে তিনি কাশী ত্যাগই স্থির করলেন। তিনি মেয়েটিকে তার অবস্থার কথা বললেন আর এ-ও বললেন যে তিনি দূরে যেতে চান। তাই একদিন পূর্বগামী ট্রেনে তাঁরা চড়ে বসলেন, এসে থামলেন ডায়মণ্ডহারবারে। এইভাবে কাশী থেকে বহুদূরে এসে তিনি গৃহস্থালী পাতলেন আর মেয়েটিকে তিনি তাঁর বিধবা বোন বলে পরিচয় দিলেন। যদিও ঐ পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ মজুরের মতো তিনি কাজ করতে আরম্ভ করলেন। যথাসময়ে মেয়েটির একটি পুত্র সন্তান জন্মাল।

ক্রমশঃ রবীন্দ্র অত্যন্ত অসুখী বোধ করতে আরম্ভ করলেন। কি উচ্চ আদর্শের জন্যে তাঁর বিপ্লবীজীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি, পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছিলেন তিনি, পুরাতন সব কিছু নষ্ট করে তিনি চেয়েছিলেন নতুন পৃথিবী গড়তে। জীবনের একটি আংশিক সমস্যার সাময়িক সমাধান করতে গিয়ে তাঁর উজ্জ্বল তরুণ জীবন নষ্ট করলেন। বোকা অযৌক্তিক, ভগ্নপ্রায় সমাজের হাত থেকে একটি মাত্র মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে ক্ষয় করলেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই আবহাওয়া তাঁর কাছে কতকাংশে খাওয়া-পরায় সুখপ্রদ হতে পারে কিন্তু তবুও এখানে থাকবার সময় সব সময়েই কাশীর জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। বিপ্লবী জীবনের কথা ভেবে ভেবে তিনি তাঁর সময় কাটাতে লাগলেন অসহিষ্ণুভাবে।

ছেলেটি কিন্তু বেশিদিন বাঁচলো না। শিশুটির মৃত্যুর পর মেয়েটির মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল। রবীন্দ্র তার জন্যে কি করেছেন সব ভুলে গিয়ে সে তার সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া করতে লাগলো। রবীন্দ্র বেচারী তো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেলেন। মেয়েটি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যেন তার সমস্ত

দুর্ভাগ্যের জন্যে রবীন্দ্রই দায়ী। তাই একদিন অসহ্য হওয়ায় রবীন্দ্র তাকে জানিয়ে দিলেন যে তাকে ছেড়ে দূরে যেতে পারলে তিনি খুবই খুশী হবেন। এ কথায় তার জ্ঞান ফিরে এল। বাইরে সে বদলে গেল। রবীন্দ্র তাকে আবার পড়াশুনো আরম্ভ করতে বললেন। সে কথা শুনলো এবং বছর দুয়েকের মধ্যেই সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে রোজগার করবার যোগ্যতা অর্জন করলো। কিন্তু রোজগার করতে আরম্ভ করেই আবার তার ব্যবহার বদলে গেল। তার ওপর এ সময়ে আবার তার আর এক প্রেমিকের আবির্ভাব হলো। কয়েক বছর পরে দেখা হ'লে রবীন্দ্র আমাকে বলেছিলেন "এতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, তার একটি প্রেমিক জুটলে আমার আর বলবার কি আছে? এটা তো অতি স্বাভাবিক; কিন্তু এমন জিনিষ দেখে আমি ব্যথা পেতাম। তারা দুজনেই আমাকে দিন মজুরি করতে দেখে ঘৃণা করতো।"

রবীন্দ্র ভাবলেন যে তাঁর মুক্তির দিন এসেছে। মেয়েটি আত্মনির্ভর হয়েছে আর তার একটি প্রেমিকও জুটেছে; কাজেই তিনি এখন তাঁর বিপ্লবীর জীবনে ফিরে যেতে পারেন। একদিন মেয়েটিকে না বলে তাঁর বন্দীজীবন ত্যাগ করে তিনি আবার এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত পৃথিবীতে। জীবনব্যাপী যুদ্ধ করেও তাঁর মনের জোর কমেনি। যুদ্ধে কি আঘাত তাঁর লাগলো সেদিকে তিনি নজরও দেননি। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ছাড় পেয়েই তিনি ভেঙে পড়লেন। যদি আর একটি যুদ্ধে তাঁর যোগ দেওয়া সম্ভব হতো তবে হয়তো আবার তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে আসতো। কিন্তু কাশীতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনকে ঘিরে যে যুদ্ধ একদিন জ্বলে উঠেছিল, তার প্রতিধ্বনিও কাশীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সমস্ত আত্মগোপনকারীরা হয় ধরা পড়েছেন নয় তো জেলে গেছেন। তাদের একজন—চন্দ্রশেখর গুলিতে মারা পড়েছেন। বাকীরা জেলে কঠিন শাস্তি ভোগ করছেন। একটা স্ফুলিঙ্গও আর দেখা যায় না। বারো বছর কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল আর দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। কি করে তাঁর চলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে ডাক্তারদাদা মাসে দশ টাকা দেন তাতেই তাঁর দিন চলে

যায়। রাজনীতি সম্বন্ধেও দু'একটা কথা হলো, আমি পরিষ্কারভাবে দেখলাম যে এই পরম বিশ্বস্ত কর্মীটি—এই ত্যাগের প্রতিমূর্তি মানুষটি এক বছরে যে নতুন বিপ্লব চলছে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। আমি আমার টাকার ব্যাগে হাত দিলাম, কিন্তু এই লোকটিকে টাকা দিয়ে অপমান করতে সাহসী হলাম না। পরে যখনই আমার এ সময়ের সাহসের কথা ভেবেছি, তখনই আমি দুঃখ করেছি, কেননা, দু'মাসের মধ্যেই এই বিরাটহৃদয় মানুষটির মৃত্যু হলো। আমি তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম দিল্লী জেলে সাধারণ অপরাধীর মৃত্যুর খবরের মতো।

আমি স্থির জানি যে ভারতবর্ষ তার নিদ্রা থেকে জাগছে একথা ভেবেই তিনি চলে গেছেন। এ কথাও তিনি ভেবে গেছেন যে পুরাতন বিপ্লবী-পন্থাতেই ভারত আবার জাগবে। এইভাবে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান অজানাভাবে চলে গেলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেল। কিন্তু যাঁদের হাঁচিকাশির খবর আজ সংবাদপত্রের প্রথম লাইনে বেরোয়, তাঁদের চেয়ে তিনি যে কত বড় মানুষ, কত উঁচু হৃদয়ের ছিলেন, সেটা আমরাই সব জানি।

রবীন্দ্রমোহনের মহৎজীবনের আর একটা ট্রেন ডাকাতির মধ্যে ব্যবধান বহু। কিন্তু এও জানতে হবে যে তারা একই ভারতীয় বিপ্লবীদলের দুটি অংশ। রবীন্দ্রের ১৯২৫ সালে গ্রেপ্তার আর শাস্তি ব্যাপারটাকে আরও ঘোরাল করে করে তুললো পার্টির সভ্যরা, প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। তাঁর গ্রেপ্তার আমাদের পাগল করে তোলেনি, কিন্তু তাঁকে জামিনে খালাস করা গেল না বলে আমরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। সামান্য অপরাধী যে সুবিধা পায় তাঁকে তাও দেওয়া হলো না। সভ্যরা সবাই একজন বড় পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো। এর জন্যে অনেক পুলিশ কর্মচারির নাম প্রস্তাব করা হলো, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে শেষ অবধি কারুর নামই ঠিক হয়নি। সবার মধ্যে পণ্ডিত রামপ্রসাদই সরকারী কর্মচারি হত্যার বিপক্ষে ছিলেন কেননা তিনি বলতেন যে তা'হলে সংযুক্তপ্রদেশের সরকার

বাংলার আদর্শ অনুকরণ করে এমন এক অর্ডিনেন্স জারি করবে যার ফলে সন্দেহমাত্রই তারা যাকে তাকে ধরে বন্দী করে রাখতে পারে। চন্দ্রশেখর, আমি আর অনেকে পার্টির এই ইতস্ততঃভাবে রেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিত-এর মীমাংসা এইভাবে সমাপ্তি হওয়ায় আমরা বুঝলাম যে ঝগড়া বৃথা। ইতিমধ্যে আরও বহু উত্তেজক ঘটনা এগিয়ে আসছিল, তাদের চাপে আমরা একথা ভুলে গেলাম।

পার্টি গ্রাম্য-ডাকাতি করার পন্থা ছেড়ে দিয়েছিল। কেবলমাত্র সরকার। রেল বা ব্যাঙ্ক লুটের কথাই তারা ভাবছিল। আমাদের পার্টির গঠন এমন ছিল যে ডাকাতি ছাড়া টাকা তোলবার আর উপায় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে চন্দ্রশেখর গোবিন্দপ্রকাশকে দলে এনেছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি উদাসী সাধুদের প্রাদেশিক সেক্রেটারী ছিল আর মোহান্তদের সঙ্গেও তার আলাপ ছিল। সে নিজে একজন বড় মোহান্তর ছাত্র ছিল আর বিপ্লবাত্মক কাজে জড়িত হয়ে না পড়লে সেও একদিন মোহান্ত হতো। গোবিন্দপ্রকাশ একদিন আমাকে জানাল যে একজন বড় মোহান্ত একজন যুবককে তার প্রধান শিষ্য করতে চায়। একজন বিপ্লবী যুবক পাঠান হোক না কেন, তাহলে সে মোহান্তের সম্পত্তিটা পাবে। আমাদের টাকার ঘাটতি ছিল, তাই ব্যাপারটা ভালো বলেই মনে হলো। আমি বহু যুবকের নাম প্রস্তাব করলাম, কিন্তু শেষে চন্দ্রশেখরকেই বাছা হোল। চন্দ্রশেখর সম্মতি দিলেন, পার্টিও দিল, আর, তারপর একদিন জিনিষপত্র গুছিয়ে তিনি গাজীপুর রওনা হলেন। মোহান্ত চন্দ্রশেখরকে প্রধান শিষ্য করতে রাজী হলেন। চন্দ্রশেখর মোহান্তের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন আর মোহান্তের কাজ শিখতে লাগলেন। মোহান্ত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা ভাবলাম যে শীঘ্রই মরে সে আমাদের উপকার করবে। আমি সাধারণ ভক্তের বেশে প্রায়ই মোহান্ত আর ভবিষ্যৎ মোহান্তের সঙ্গে দেখা করতাম। চন্দ্রশেখর কিছুদিন সেখানে থাকবার পর তার মনে অসন্তোষ দেখা দিল। সে বৃদ্ধ মোহান্তের মৃত্যু অবধি আর অপেক্ষা করতে রাজী হলো না। মোহান্ত কাগজ কিনতো না বা পড়তোও না। মোহান্তদের মধ্যে দু'রকম লোক দেখা যায়—কেউ নোতুন-পন্থী, কেউ পুরাতন-পন্থী। এই

মোহান্ত ছিল পুরাতন-পন্থী। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না, অবশ্য, মোহান্তের রাজনীতিজ্ঞ হবার প্রয়োজনও নেই। চন্দ্রশেখর আজাদ কাগজ পেতেও পারতো, পরতেও পারতো, কিন্তু আমরা মোহান্তজীকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিতে চাইতাম না যে সে রাজনীতিজ্ঞ। তাই গাজীপুরে থাকার সময় বেচারিকে কাগজ না পড়েই কাটাতে হতো। এই মোহান্তরা গুরুগ্রন্থ সাহেব পড়তো, তাই আজাদকেও গুরুমুখী শিখতে হলো। তাকে দুধ দোয়ান, গুরুকে খাওয়ান শিখতে হলো। আমি একবার দেখা করায় সে বললে যে সে আর পারছে না। মোহান্ত দু'জনের করে' দুধ খায়, আর নিয়মিত ব্যায়াম করে। কাজেই মরার লক্ষণ তার মধ্যে নেই। আমি তাকে বহু সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু এর দু'মাস পরেই সে কাশীতে পালিয়ে এলো। এইভাবে দলের জন্যে মোহান্তগিরি বাগাবার স্বপ্ন আমাদের মিলিয়ে গেল। কাজেই ডাকাতি অবধারিত হয়ে উঠলো। কেবল প্রশ্ন রয়ে গেলো, লুট করবো কি : ব্যাঙ্ক না রেলওয়ে সম্পত্তি, না কোনরকম সরকারী অর্থভাণ্ডার? শেষ অবধি রেলওয়ে সম্পত্তি লুঠ করাই ঠিক হলো, আর, এটা এমনভাবে করা ঠিক হলো যাতে পার্টির রাজনৈতিক প্রকৃতিটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটা হবে সরকারী শক্তির প্রতি প্রত্যক্ষ বিরোধের আহ্বান। যারা রবীন্দ্রমোহনের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তারা সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনায় খুশী হয়ে উঠলো। গ্রাম্যডাকাতি করে তারা ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। নিরপরাধী গ্রামবাসীকে মেরেও তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আসফক্ ভীষণভাবে এর বিপক্ষে ছিল। সে বলতো প্রত্যক্ষ বিরোধের আহ্বান এটা বটে কিন্তু এটাই দলের মৃত্যু আনবে। সে বলতো যে যতক্ষণ অবধি পার্টি সম্মুখ যুদ্ধে অসমর্থ ততদিন শান্তভাবে তার নিজেকে গড়ে তোলাই উচিত। সে বলতো যে জোর করে 'দান' গ্রহণ করার কাজে নিরত থাকলে সরকারের সন্দেহ বাড়তে থাকবে। আর অল্পদিনের মধ্যেই সরকার আমাদের চিনে ফেলবে। পণ্ডিত রামপ্রসাদ নতুন-পন্থাকে মেনে নেওয়ায় আসফকের কথা অরণ্যে রোদন মাত্র হলো। আমার মনে হয় পণ্ডিত রামপ্রসাদ গ্রাম্য-ডাকাতির বিরোধীও ছিলেন না, কিন্তু প্রাদেশিক সভার

অসম্মতি আর বারংবার অসফলতার জন্তেই মত বদলাতে তিনি বাধ্য হলেন।

কি করে ট্রেন ডাকাতিকে সফল করা যায় তার সম্বন্ধে বহু পন্থা বাতলানো হলো। প্রথমে একটা খুব ছোট স্টেশনে গাড়ী থামলে ট্রেন লুঠের প্রস্তাব করা হলো। এর সঙ্গে স্টেশন মাস্টার, গার্ড আর ইঞ্জিন-চালককেও হঠাৎ আক্রমণ করবার প্ল্যান করা হলো। এও প্রস্তাব করা হলো যে গার্ড বা ইঞ্জিন-ড্রাইভার যদি ইংরেজ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করা হবে। পণ্ডিত রামপ্রসাদ এই দুটো একসঙ্গে মিশানোর বিপক্ষে ছিলেন, আর, যতক্ষণ অবধি না তাকে আশ্বাস দিলাম যে ভারতীয় বা ইউরোপীয়ান কাউকে আমরা হত্যা করবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কাজেই এই প্ল্যানটা বর্জন করা হলো।

শেষ অবধি একটা প্ল্যান স্থির করা হলো। ঠিক হলো কোনো আপ্-স্টেশনে গাড়ীতে চড়া হবে। তারপর দুটো স্টেশনের মাঝে চেন টেনে গাড়ী থামান হবে। তারপর টাকার সিন্দুক আর সব বার করে নেওয়া হবে।

প্রত্যেকদিন এইট্ ডাউন ট্রেন সারাদিনের রোজগার লক্ষ্ণৌ-এর প্রধান অফিসে এনে দেয। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রেলওয়ের একদিনের আয় নেওয়া। অবশ্য কোনো আপ্-স্টেশনে গাড়ী চড়া আর দুটো স্টেশানের মধ্যে চেন্ টেনে গাড়ী থামাবার প্ল্যানটা একটা আকস্মিক বিপদের জন্যে বিপ্লবীদের ইতিহাসে বেশী দাম পেলো। আর ওই আকস্মিক বিপদের জন্যই স্টেশন মাস্টার আর গার্ডকে হত্যা করার প্ল্যানটাও মাটি হলো। এবার বলা যাক কি করে ঐ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলো, আর, কি করেই বা সেটা আমাদের সমস্ত প্ল্যানটাই উল্টে দিলো।

আমরা আমাদের নিজ নিজ স্থান থেকে দশজন লোক ট্রেন ডাকাতির জন্য লক্ষ্ণৌএ এসে হাজির হলাম। আসল কিংবা বলা যায় অপেক্ষাকৃত বড় দলটা "ছেদিলাল ধরমশালায়" উঠলো। তারা অবশ্য দল হিসাবে সেখানে রইলো না। রইলো আলাদা আলাদা ভাবে, যেন কেউ কাউকে চেনে না। যাদের লক্ষ্ণৌতে থাকবার জায়গা আছে তারা সেখানে রইলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা

আমাদের লুকানো লুকানো জায়গা থেকে বেরুলাম। তারপর পায়ে হেঁটে পরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ট্রেন সেখানে থামলেই স্টেশনমাস্টার প্রভৃতিকে ধরবো। সেই জন্যেই আমরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গভীর হতাশার সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আমাদের পৌঁছাবার আগেই ট্রেনটি বেরিয়ে গেল। আমাদের প্রায় দশ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্ণৌএ ফিরে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় রইলো না। এই ট্রেনটাই আমাদের অভীষ্ট এইট্ ডাউন ট্রেন কিনা সেটা ভালো করে জানবার জন্যে আমরা একজন লোক পাঠালাম। ইতিমধ্যে আমরা বাইরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। স্টেশনে গিয়ে পুলিশের সন্দেহ উদ্রক্ত করবার কোনো প্রয়োজন দেখলাম না।

আমাদের লোকটি ট্রেনের খবর আনবার পর আমরা লক্ষ্ণৌএ ফিরে এলাম। এ সময়ে গোবিন্দচরণ কর লক্ষ্ণৌএ বাস করছিলেন। তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই সাহায্য করলেন। কিন্তু ডাকাতিতে তিনি যোগ দিলেন না। আমরা তাকে যোগ দিতে বললাম। কিন্তু নানা ওজর আপত্তি দেখিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। যাই হোক তাঁর সাহায্যে আমাদের খুবই উপকার হলো।

পরদিন ১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট আমরা পৃথক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করলাম। ট্রেনে করে পরবর্তী আপ্ জংশনে এসে আমরা পৌঁছলাম। এই সময়ে আমরা আর কোনো দলের আশ্রয় গ্রহণ করলাম না। এই সময়ে ট্রেন আর আমাদের ঠকাতে পারবে না, কেননা, আমরা নিজেরাই ট্রেনে চড়ে থাকবো। কথামত আমরা সবাই চারটার সময় এইট ডাউন ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমাদের মধ্যে তিনজন—আসফক, রাজেন্দ্র লাহিড়ী আর বক্সী সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় চড়ে বসলো। বাকী সাতজন পণ্ডিত রামপ্রসাদ, কেশব চক্রবর্তী, মুরারীলাল, মুকুন্দলাল, চন্দ্রশেখর, আমি আর বানওয়ারীলাল সমস্ত ট্রেনে ছড়িয়ে পড়লাম। যাঁরা সেকেণ্ড ক্লাসে আছে তারা চেন্ টেনে গাড়ী থামাবে, আর বাকীরা ছুটে গিয়ে গার্ড প্রভৃতিকে ধরে মাল লুট করে নেবে, প্ল্যানটি অক্ষরে অক্ষরে মানা হবে। ঠিক সময়েই সহকর্মীরা চেন্ টানলো,

গাড়ী থেমে গেল। যখন ট্রেন থামলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সামান্য আলো আছে, আমাদের কাজ উদ্ধারের উপযুক্ত সময়!

ট্রেন থামা মাত্র আমরা থার্ডক্লাস গাড়ী থেকে নেমে এলাম। তারপর আমাদের ওপর যে সব কাজের ভার আছে, সেগুলো সম্পন্ন করার জন্যে এগিয়ে গেলাম। গার্ডকে একেবারে ফেলে দিয়ে প্রত্যেক স্টেশান থেকে রোজগার করা টাকার বাক্স মাটিতে নামানো হলো। একটা বিরাট হাতুড়ি আর ছেনী তৈরী ছিল। কাজেই অন্যরা বাক্সটা ভাঙ্‌বার চেষ্টা করতে লাগলো। দু'দিকে দু'জন লোক পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই ব্যাপারে বারোটা গাদা বন্দুক আর রাইফেল ছাড়া আর কিছুই আনা হয়নি। পিস্তলগুলোর সঙ্গে বাঁটগুলো আটকে সেগুলোও এখন রাইফেলের মতোই হয়ে গেল। ট্রেনে একজন ইংরেজ মেজর বা কর্ণেল ছিল, তার একটা কিন্তু রিভলভার ছিল। তাছাড়াও আমাদের লোক লক্ষ্য করেছিল যে গাড়ীতে একটা সশস্ত্র কনেষ্টবলও যাচ্ছে কিছু মাল নিয়ে। কাজেই আমরা বিপক্ষের আক্রমণ আশা করছিলাম।

গাড়ী থামিয়ে আমরা নিজের নিজের জায়গা বেছে নেওয়া মাত্র যাত্রীরা ভারী ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সরকারী মাল লুঠ করা। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবার জন্যে আমরা দু'বারগুলি ছুঁড়লাম। ইতিমধ্যে সিন্দুক ভাঙার কাজটা ঠিকমতো এগোচ্ছিল না। এই দিকের অসফলতায় সব ব্যাপারটাই নষ্ট হতে বসলো। আসফক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিল। একথা শুনে সে আমাকে তার পিস্তল দিল, দিয়ে সিন্দুকটা খুলতে গেল। বাস্তবিকই পণ্ডিত রামপ্রসাদের পর সে-ই ছিল দলের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। সে বড় হাতুড়িটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলো। হাতুড়ীর শব্দটা বহুদূর অবধি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সকলের চোখে সাফল্যের যেন আলো জ্বলে উঠলো। কিন্তু এই সময়ে একটা ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগলো যে ট্রেনটা যেন কাছে আসছে। সত্যিই, সন্দেহ করবার আর কিছুই নেই যে একটা ট্রেন আমাদের দিকে আসছে। কি ট্রেন এটা? কি করে এত তাড়াতাড়ি

লুটের খবর পেল এরা ? কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য। বিদ্যুতের মতো এই ভাবনাগুলো আমাদের মাথায় খেলে গেল। যেই মনে হলো বোধহয় সশস্ত্র মিলিটারী ট্রেন আমাদের দিকে আসছে। ভয়ের একটা বিদ্যুৎ চিড়িক দিয়ে গেল বুকের মধ্যে। আমরা সবাই আমাদের নেতার দিকে তাকালাম। তিনি ভাবছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। বোধ হলো চরম দুর্ভাগ্যই যদি ঘটে তবে দলপতি আমাদের সামনাসামনি যুদ্ধের হুকুম দেবেন। পালিয়ে যাবার কথা তো ভাবাই যায় না। তা' ছাড়া এটাকে আমরা কি বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুযোগ বলেই গ্রহণ করিনি। আমরা আমাদের হাতের অস্ত্রটা আরও জোরে চেপে যে দিক দিয়ে ট্রেনটা আসছে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে অবিশ্রান্তভাবে আসফাকের হাতুড়ী এসে পড়তে লাগলো সিন্দুকটির ওপর, গর্তটা ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো। ধরণীর ওপর রাতের কালো ওড়না ধীরে ধীরে নেমে আসছে, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। যাত্রীরা প্রথমটা যে চেঁচামেচি করেছিল, তা-ও আর শোনা যায় না, তাদেয় শান্ত করবার জন্যে যে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তারই জন্যে এই নিস্তব্ধতা। প্রথমেই যাত্রীদের বলা হয়েছিল যে আমরা সরকারী মাল লুঠের জন্যে এসেছি সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু বুলেটের জন্যেই তারা থামলো। তাছাড়া তারাও বোধহয় আর একটা ট্রেন আসার শব্দ শুনেছিল। ইতিমধ্যে ঐ ট্রেনটির অগ্রভাগ দেখা গেল। অপ্রতিরোধনীয় নিয়তির মতো ট্রেনটা এগিয়ে আসতে লাগলো। আমাদের জন্যে এটা কি আনছে ? মৃত্যু ? কে জানে ? এসময়ে পণ্ডিত রাম লক্ষ্য করলেন যে এইট ডাউন ট্রেনটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ডবল রেলপথ রয়েছে। এটা দেখেই তার মনে পড়লো যে এ সময় পাঞ্জাব মেল যায়, আর নিঃসন্দেহ যে এটাই পাঞ্জাব মেল। তিনি তখুনি আমাদের একথা বললেন, আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পনেরো দিন ক্রমান্বয়ে টাইম টেবিল দেখা সত্ত্বেও কি করে যে একথাটা ভুলে গিয়ে-ছিলাম, সেকথা ভেবে সবাই অবাক হলাম। কাজেই এটা মিলিটারী ট্রেন ছিল না। কিন্তু তাতেই সব বিপদ দূর হলো না। যদি তারা আমাদের অনুসরণ না-ও করে তবেও ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতি যদি ট্রেনটাকে এই জঙ্গলে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে তবে কি তারা কিছু সন্দেহ করবে না? তাছাড়া এ ট্রেনের যাত্রীরাও তো চিৎকার করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

কিন্তু আমাদের ভাববার আর সময় ছিল না। পণ্ডিত রামপ্রসাদ রয়েছেন আমাদের নেতা, ভাববার কিছু নেই আমাদের। যদি ঐ রকমই কিছু ঘটে তবেও তিনি তা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় খুঁজে বার করবেন। তিনি কি এর চেয়ে বিপদজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাননি? হতে পারে, তিনি আমাদের চলে যাবার আদেশ দেবেন, হতে পারে, তিনি নিকটস্থ গাছের অন্ধকারে আমাদের আশ্রয় নিতে বলবেন আর সেখান থেকে আমাদের লড়াই করতে আদেশ করবেন। এ সময়ে ট্রেনটা প্রায় আমাদের ওপর এসে গিয়েছিল। রামপ্রসাদ এ সময়ে আমাদের সমস্ত অস্ত্র লুকিয়ে ফেলতে বললেন। আসফককে হাতুড়ী তুলতে এবং অন্য সবাইকে একটু আড়ালে দাঁড়াতে বললেন। মেলটি তীব্রগতিতে যাচ্ছিল এবং এক মিনিটের মধ্যেই ওটা চলে গেল।

যাই হোক, বিপদ তো কেটে গেল। প্রতি মুহূর্তেই এটা আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ট্রেনটির সামান্য শব্দ মাত্র শুনতে লাগলাম। আবার আসফকের হাতুড়ী চললো আর সিন্দুকের সব টাকা বেড়িয়ে পড়লো। এখন শেষ কাজ করা বাকী। মাল সংগ্রহ করে পালাবার হুকুম দেওয়া হলো। কি করে ফিরলাম তার খুঁটিনাটি দেবার দরকার দেখি না। আমরা পায়ে হেঁটে লক্ষ্ণৌএ গেলাম, অবশ্য, রেলওয়ে লাইন ধরে নয়। চকের দিক দিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌএ পৌঁছুলাম। এটা শুধু বড় বাজারই নয়, বেশ্যাপল্লীও বটে। একথা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে এদিকে লোক বহু রাতে রাস্তা চললেও লোকে কোন সন্দেহ করে না। কাজেই আমাদেরও কেউ লক্ষ্য করলো না। তখুনি মাল নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো—অস্ত্রশস্ত্রও নিরাপদ স্থানে পাঠান হলো। যাদের যাবার জায়গা ছিল, তারা সেখানে চলে গেল, কিন্তু আমার মতো যারা সহরটাকে ভালো করে জানতাম না তারা পার্কে রাত কাটালাম। খুব ভোরে ধার্মিক লোকেরা যখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন তখন আমরা উঠে ভিড়ের সঙ্গে মিশে

গেলাম। একটু পরে "Indian Daily Telegraph"এর হকার চিৎকার করতে লাগলো—"কাকোরীর কাছে রোমাঞ্চকর ট্রেন ডাকাতি", আমি একটা কিনলাম। ভোরের ম্লান আলোতে দেখলাম ঐ খবরে অনেকগুলো কলমই ভর্তি। এই রিপোর্ট থেকে জানলাম যে একজন ইউরোপীয়ান সমেত তিনজন মরেছে। অবশ্য আমাদের কেউই এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এ সময়ে আমি ছিলাম একজন সন্ত্রাসবাদী Blanaquinist দুঃসাহসিক, তাই দুজন ভারতীয়ের মৃত্যুতে দুঃখিত হলেও শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুতে আমি খুশীই হলাম। কি করে যে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো তা ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি বুঝতেই পারলাম যে বোধহয় যে ক'জন যাত্রী ভয় দেখানো সত্ত্বেও সরে যায়নি, কোন রকমে গুলি লেগে তারাই বোধহয় মারা যায় আজ। একথাও উল্লেখ করা দরকার যে Indian Daily Telegraph আমাকে ভুল খবর দিয়েছিল। পরে জানতে পারি যে কোন শ্বেতাঙ্গই মারা পড়েনি। অবশ্য দৈবক্রমে একজন ভারতীয় যাত্রী মারা যায়। যখন গুলি চলছিল তখন সে অন্য কামরায় তার নববিবাহিত স্ত্রীকে দেখতে যাচ্ছিল। এইভাবে তাকে কামরা থেকে না নামবার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা অমান্য করেই সে মারা যায়। এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত লোকটির নাম ছিল আমজাদ আলি। শ্বেতাঙ্গের খবরটা একটু আলাদা ছিল। যখন ডাকাতি আরম্ভ হয় তখন ঐ শ্বেতাঙ্গ মেজর বা কর্ণেলটি কামরার সব দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। আর ট্রেনটি লক্ষ্ণৌএ পৌঁছাবার আগে অবধি সে পায়খানায় বসেছিল।

সেই দিনই আমরা আমাদের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

পুলিশ ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে উঠলো। অপরাধীদের যে সন্ধান দিতে পারবে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো। প্রত্যেক থানা আর রেলওয়ে স্টেশনে এই নোটিশ সেঁটে দেওয়া হলো। তাতে খুব চাঞ্চল্য পড়ে গেল। জনসাধারণ কিন্তু ট্রেন-লুণ্ঠনকারীদের বিষয় কিছুই জানতো না।

ট্রেন-লুণ্ঠনকারীদের প্রতি জনসাধারণের যেন হঠাৎ দরদ দেখা দিল। ইংরেজ সরকারের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা এতই বেশি ছিল যে কেউ যদি সরকারের বাড়ীতে ঢিল ছোঁড়ে বা রাজার প্রস্তরমূর্তিতে আলকাতরা মাখায়, তা'হলেই সে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্বর্ধনা লাভ করে। অবশ্য সরকারের পীড়ন-নীতিতে লোকে ভয় পায়, আর তাদের সহানুভূতিও এত গভীর নয় যে তাদের মতামতের জন্যে তারা কোন বিপদের ঝুঁকী নিতে পারে। কিন্তু তবুও বিপদের সম্ভাবনাতেও তাদের গোপন দরদ মরে যায় না, শুধু আত্মপ্রকাশ করে না এই মাত্র। ভারতের জনসাধারণ তখন বৃটিশ-বিরোধী পার্টিকে এতই ভালোবাসতো যে তারা তাদের যে কোনো প্রকার কার্যকলাপ মনে মনে তারিফ করতো। এই ব্যাপারে তারা মার্কসবাদী, সমাজতন্ত্রী, ফ্যাসিস্টপন্থী বা চক্রপন্থী কিছুই বিচার করতো না।

যদি আমরা আরও ছয় মাস সময় পেতাম, তবে পার্টি যে খুব বেশী বাড়তে পারতো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র আমলাতন্ত্রীরা এই সুযোগ পেতে দিলো না। তারা খুব সজাগ হয়ে উঠলো। বৃটিশ আমলাতন্ত্র সাধারণতঃ ধীর গতিতেই চলে। বেশী নিয়ম-কানুনের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে নড়ে চড়ে এটা বম; কিন্তু আমলাতন্ত্রের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলেই তারা প্রাণপণে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। পুলিশরা এইমাত্র খবর পেয়েছিল যে কাকোরী ট্রেন-লুঠের ব্যাপারটা হলো বিপ্লবীদের কাজ, এই পার্টির কাজ সারা প্রদেশে ছড়ান আছে, আর এই লোক বোধহয় তার সঙ্গে সংযুক্ত।

এই সব অস্পষ্ট খবরই পুলিশের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এ রকম অস্পষ্ট খবর তো সরকার কোর্টে হাজির করতে পারে না। অবশ্য সরকারের অধীন এমন সব কর্মচারী আছে যারা সাক্ষীর আমদানী করতে পারে। কিন্তু যতই হোক খানিকটা তো সত্য ঘটনা চাই, যার চারিদিকে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দীগুলো গড়ে উঠবে। পরে আমরা জেনেছিলাম যে উচ্চ পুলিশ কর্মচারীরা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। এদের সমস্যা ছিল এই অবস্থার গ্রেপ্তার করা যায় কিনা। একদল বললে যে আরও নির্দিষ্ট খবর না

পেয়ে এ সময়ে গ্রেপ্তারের কোনো ফল হবে না। অন্য দল বললো যে এখুনি ধরা উচিত তারপর সাক্ষীর কথা ধরা যাবে। সরকার প্রথমটা ইতস্তত: করে তারপর গ্রেপ্তার করাই স্থির করলো। এটা ছিল সরকারের জীবন-মরণের প্রশ্ন। প্রত্যেক জেলা থেকে খবর পাওয়া গেল যে রোজই বিপ্লবী দল সংগঠিত হয়ে উঠছে। কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। যারা গ্রেপ্তারের পক্ষে মত দিয়েছিলো তারা বোধহয় বেঙ্গল অর্ডিনেন্স, যা'তে বেশী সাক্ষীর দরকার হয় না, তার ওপর নির্ভর করেই এটা ঠিক করেছিল।

প্রাদেশিক পুলিশ একই সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার আরম্ভ করলো। এই অনুসারে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বাড়ী ১৯২৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রে পুলিশ ঘিরে ফেললো। আমি জানতাম না যে রাতে পুলিশ আমার বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। খুব জোরে দরজায় ধাক্কা মারার শব্দ পেলাম। ভাবলাম বুঝি ঝি এসেছে বাসন মাজতে। দরজা খুলতে গেলাম। কিন্তু খোলামাত্র রিভলভারের উদ্যত নল আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর আমি শুনলাম যে মহামান্য সম্রাটের নামে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। পিছনে বেয়োনেট দেখা গেল, পুলিশ সব রকম বিপদের জন্যেই যে তৈরী হয়ে এসেছে, তা বোঝাই গেল। আশ্চর্যের কথা এই যে পুলিশের বড়কর্তাদের দেখা গেল না। আমি নিরাপদে ধরা পড়বার পর তাঁদের আবির্ভাব ঘটলো। গ্রেপ্তারের পরে বাড়ী খানাতল্লাস আরম্ভ হলো। তারা কিছু আগ্নেয়াস্ত্রের আশা করেছিল। কিন্তু তাদের হতাশ হতে হলো। তারা কিন্তু এমন একটা জিনিষ পেলো যা তাদের স্বপ্নের অতীত ছিল। তারা একটি হল্‌দে কাগজ মানে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের একটা শাসন পরিকল্পনা পেল। ভুল করে আমার বাক্সে ঐ কাগজটা রয়ে গিয়েছিল। পুলিশ এটা খুঁজে বার করলো। এটার অস্তিত্ব জানলে বাবা নিশ্চয়ই এটার অস্তিত্ব নষ্ট করে দিতেন। তাঁর সে সুযোগও ছিল। কিন্তু এটা ধরা পড়বার পরই তিনি একথা জানতে পারলেন। এটা পাওয়ায় পুলিশের খুবই উপকার হলো। পুলিশ কর্মচারীদের কথাই ঠিক হলো। গ্রেপ্তারের মধ্যেই তারা সাক্ষীর সাক্ষাৎ পেলো। এর পরে জ্যান্ত-সাক্ষী বা এ্যাপ্রুভারেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

আমরা ধরা পড়বার সময়ে কাশীর প্রায় ডজনখানেক বাড়ী পুলিস সন্দেহজনক লোক আর বই-খাতার সন্ধানে খানাতল্লাস করছিল। রাজেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ী খানাতল্লাস করা হলো। কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না। কেননা আমি আগেই লিখেছি যে তিনি কলকাতায় বোমা তৈরী শিখতে গিয়েছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ীও খানাতল্লাস করা হলো। কিন্তু তাকেও পাওয়া গেল না। শচীন বক্সী দৈবক্রমে বেঁচে গেল। তিনি সে-রাত্রে বারোয়ারী থিয়েটারে গিয়েছিলেন। থিয়েটার শেষ হলে একদল যুবকের সঙ্গে তিনি দুর্গাবাড়ীতে গেলেন। তার মধ্যে ধর্মের বুজরুকী ছিল না, কিন্তু তবুও গেলেন। কেননা, আমাদের পার্টির জন্যে আমরা যুবক সংগ্রহ করতাম এই ভাবে মিলে। এই সময় যে পুলিশ গুপ্তচর তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতো সে তাঁকে খুঁজে পেল না। সে খবরই পায়নি যে বক্সীকে সকালে ধরা হবে। জানলে সে নিশ্চয়ই তার ওপর আরও তীব্র দৃষ্টি রাখতো। সে ভেবেছিল যে সারারাত থিয়েটার দেখে বক্সী নিশ্চয়ই বাড়ীতে ঘুমোতে যাবে। তাছাড়া সে ভাবতেই পারেনি যে বক্সী আবার দুর্গাবাড়ী যেতে পারে। দুর্গাবাড়ী থেকে ফিরে দূর থেকে দেখে বক্সী বুঝলেন যে ব্যাপার কিছু গুরুতর। কাজেই বাড়ী ফেরার বদলে তিনি আত্মগোপন করলেন। আর সেখান থেকেই কি ঘটে তিনি দেখতে লাগলেন। কাজেই তিনি সে-যাত্রায় আর ধরা পড়লেন না। কাশীর পুলিশ কানপুরের সুরেশ ভট্টাচার্যকে ধরলো। আসলে কানপুরের পুলিশই তাঁকে ধরতো। কিন্তু তিনি কাশীতেই পূজো কাটাচ্ছিলেন বলে কাশীর পুলিশই তাঁকে ধরলো। রামনাথ পাণ্ডে, রাজেন্দ্রবাবুর চিঠির বাক্স যাকে বলা হতো, সেও ধরা পড়লো।

জেলের দরজা আমার অজানা নয়। তাই যতটা বিচলিত হবার কথা ততটা বিচলিত হইনি। যখন জেলে ঢুকলাম তখন সেখানে জেলার ছিল। জেল-প্রবেশের সমস্ত আদব-কায়দা শেষ হলো। আমাকে খুব করেই খানাতল্লাস করা হলো। আমার নাম, আমার বাবার নাম, বয়স, জীবিকা টুকে নেওয়া হলো। আমার কাপড়-চোপড় গোনাগাঁথা হলো, আমার চুল, দাড়ীর (সেটা অবশ্য বেশী নয়) দৈর্ঘ্য মাপা হলো। আমার রঙ, কাপড়ের

রঙ লিখে নেওয়া হলো। এসব শেষ হলে জেলর খুব ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে প্রথম ওয়ার্ডারকে বললো যে "একেও প্রথমে সেখানে নিয়ে যাও। তারপর জেলে নিয়ে যাবে।" "সেখানে" কথাটায় আমার কৌতূহল হলো। কিন্তু জেলে আশা করা হয় কারুর কোনও কৌতূহল থাকবে না। তাকে পুতুলের মতো সব হুকুম মানতে হবে। "সেখানে" কথাটায় ভাবলাম কোথাও বুঝি আমাকে অত্যাচার করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে। কেননা আমি শুনেছিলাম যে এসব করা হয়। ঘটনাস্রোতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কি ঘটে তা দেখবার জন্যে। তাছাড়া আমি সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম, কাজেই যেখানেই নিয়ে যাক তাতে কিছু এসে যায় না। আমি নিঃশব্দে ওয়ার্ডার আর অপরাধী পরিদর্শককে (overseer) অনুসরণ করলাম। আমি জেলখানাকে খানিকটা চিনতাম। আমাকে জেলের ভিতর নিয়ে যাওয়ার বদলে তারা আমাকে ঘোরানো পথে এমন জায়গায় নিয়ে গেল যেটা আমার একেবারে অচেনা। সেখানে কয়েকজন ওয়ার্ডার আর কয়েকজন বন্দী ছিল। আমি ভেবে অবাক হলাম যে আমাকে নিয়ে তারা কি করতে পারে? সমস্ত লোকই চুপ করে ছিল। আমার আগমনে আরও আরও চুপ করে গেল। জানি না কি ঘটবে! বন্দীদের হাতে কোন ছড়ি দেখলাম না। খালি ওয়ার্ডারের হাতে নিয়ম মতো একটা করে বেটন ছিল। কাছেই একটা হাপর আর কয়েকটা যন্ত্রপাতি দেখলাম। ওয়ার্ডার আমাকে ঐ কামারের কাছে এগিয়ে যেতে বললো, আর সে সম্মুখস্থ প্রায় বিশ জোড়া বেড়ী থেকে একটা উপযুক্ত বেড়ী খুঁজতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ সব জিনিষটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা আমার পায়ে বেড়ী বেঁধে দেবে। আগেরবার জেলে থাকবার সময় আমি বেড়ী-পায়ে অপরাধী দেখেছিলাম। কিন্তু আমার বা আমার কোন সঙ্গীর বেড়ী ছিল না। কাজেই এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। দক্ষ বন্দী অল্প সময়ের মধ্যেই তার কাজ করে ফেললো। আমাকে বেড়ী বাঁধার পর ওয়ার্ডার ভাল করে ওটা পরীক্ষা করলো। তারপর আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা সেল বোধ হয় আমার জন্যেই নির্দিষ্ট-

ছিল। আমাকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো, আর তারপরেই সব নিঃশব্দ। আগের মতো এবারও একটা তখলী, কটোরী, মাদুর আর একটা কম্বল দেওয়া হলো। আমাকে লণ্ঠন দেওয়া হয়নি। আদিম যুগের গুহাবাসির মতো সূর্যকেই হতে হলো আমার একমাত্র আলোর আধার।

সেলে একলা হয়ে আমি আমার ভাবনা চিন্তা গুছিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমার মতো আমার সঙ্গীরা যারা ধরা পড়েছে তাদের কথাই আমার আগে মনে পড়লো। কার্যকারণ ভেবে দেখলাম যে তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই আমার মতো। জেলের ভূগোল topography কিছুটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। বহু ভেবে ঠিক করলাম যে জেলের সেলযুক্ত মাঠ যখন একটা, তখন তারাও এই চৌহদ্দীর মধ্যেই কোথাও আছে। অবশ্য চৌহদ্দীটা খুব ছোট নয়, কাশীর প্রায় বিশটা বাড়ী এখানে তৈরী হতে পারে। আমার সঙ্গীরাও এই চৌহদ্দীর মধ্যে আছে এই চিন্তায় আমি যে কি সান্ত্বনা পেলাম, ঐ অবস্থায় যাঁরা পড়েননি তাঁরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই সময়ে এত কাছে থেকেও আমরা কত অসহায় একথা ভেবে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। মনে হলো এই দূরে সরিয়ে রাখা হলো অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা, কেননা, এতে তো কারোর কোনো উপকার হবে না। এর পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে লণ্ঠন আর বই না দিয়ে এই নিঃসঙ্গভাবে ফেলে রাখাই হলো বন্দীদের ওপর সুচিন্তিত অত্যাচার। যারা বুদ্ধিজীবী তাদের পক্ষেই এটা বেশী কষ্টকর। জেলের সাধারণ খাবার আমাকে দিয়ে রাতের মতো তালা লাগিয়ে দেওয়া হলো। আমার কোন আলো ছিল না, কাজেই একটু অন্ধকার হতেই আমি ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়লাম। যদি বেড়ী না দেওয়া হতো তবে সেলের মধ্যেই একটু ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু বেড়ী-বাঁধা অবস্থায় শোয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। আমার ঘুম এলো না; শুধু ভাবনাগুলো মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অন্ধকার হবামাত্র জেলে যেন এক নোতুন জীবন জেগে উঠলো। কাছের সেলে ছিল অন্য অপরাধীরা, তারা তাদের সেল থেকে পরস্পরের সঙ্গে চীৎকার করে কথা বলতে লাগলো। তাদের কথাবার্তা কিছু চিত্তাকর্ষক ছিল না। সাধারণ অবস্থায় আমি তাদের কথায় কান

দিতাম না। কিন্তু এখন উৎকর্ণ হয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলাম। স্বর শুনে বোঝা গেল আমার সবচেয়ে কাছের লোকটি কিশোর বয়স্ক, আর তার অপরাধী জীবনে এই বোধহয় প্রথম প্রবেশ। তাদের কথাবার্তা যৌন বিষয়ে, অপরাধ আর জেল জীবন বিষয়ে। আমাদের বিষয় যখন তারা আলোচনা করতে লাগলো তখনই আরও মন দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। তাদের কথা থেকে বুঝলাম যে আমার সব সঙ্গীরাই এই চৌহদ্দীর মধ্যেই আছে। তারা আমাদের অপরাধের বিষয়ে আলোচনা করছিল। আমি নিজেই জানতাম না যে কি অপরাধে আমাকে এখানে ধরে রাখা হয়েছে। ছেলেটির কথা থেকে বুঝলাম যে আমাদের বিরুদ্ধে বোমা তৈরীর অভিযোগ আনা হয়েছে। বোমা তৈরির কথাটা মানে একেবারে ঐ কথাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ ভাবে সমস্ত বিপ্লবী কাজকেই তারা ঐ নাম দেয়।

ইতিমধ্যে আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে একেবারে সরিয়ে রাখা হলো। সকালে আর বিকেলে কেবল শারীরিক প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারতাম। একজন বেরুলে, অপরকে সেলে থাকতে হতো। অন্ততঃ হুকুম তাই ছিল। কিন্তু নানা কারণে সে হুকুমটা মানা হতো না। কেন না জেল কর্তৃপক্ষ দেখলো যে আমাদের প্রতি বেশি দৃঢ় হবার দরকার নেই। তারা দেখলো যতটা তারা শুনেছিল, ততটা ভয়ঙ্কর আমরা নই। Dr. whyte জেল পরিদর্শক সব কর্মচারীর মধ্যে তবু একটু ভদ্র ছিলেন। তার সঙ্গে পুলিশের সদ্ভাব ছিল না। সমস্ত বন্দীরা প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল ; আমাদের তারা উপকারও করতো। তারা আমাদের খবর নিয়ে যেত ; জেল অফিসে আমাদের বিষয় কি হচ্ছে বলতো, কোন ওয়ার্ডার আর বন্দী যে গুপ্তচর তা জানিয়ে যেত, কাকে বিশ্বাস করতে পারি সে কথাও জানিয়ে দিত। এ সময়ে পুলিশ জেলার যাতে আমাদের ওপর কড়া হয় তারই চেষ্টা করতো, কিন্তু জেলারের এ বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত আকর্ষণ না থাকায় সে প্রয়োজন মতো কড়া হতো, তার বেশি বা কম নয়। ওয়ার্ডারগুলোর নৈতিক চরিত্র বড় খারাপ ছিল, এক একটা চিঠি বাড়ী পাঠাতে এক একটা ওয়ার্ডার

এক টাকা করে চাইতো। আমরা তার সুযোগ নিতাম। যখন যে dutyতে থাকতো তখন সে এক সঙ্গে দু'তিন জনকে ছেড়ে দিত। যার জন্যে জেলে পরিদর্শক থেকে ওয়ার্ডার অবধি আমাদের প্রতি করুণাপরবশ হয়েছিল, তার কারণ হলো আমাদের ধরা পড়ার তৃতীয় দিন কমিশনার গবর্ণরের পরই যাঁর পদ—তিনি জেল দেখতে এলেন, তিনি আমাদের গ্রেপ্তারের খবর শুনেছিলেন। তিনি Mr. Whyteকে আমাদের দেখিয়ে দিতে বললেন। Whyte আমাদের দেখিয়ে দিল, পরিচয় করিয়ে দিল না। আমাকে দেখান হলে তিনি হেসে মন্তব্য করলেন "এরা তো ছাত্র, এদের বেড়ী কেটে দাও।" জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, পরিদর্শক Whyte-ও সেখানে হাজির ছিলেন, স্বরাজবলি জেলরও সেখানে ছিল, তারা হুকুমটা নোট করে নিল। আমরা ভাবলাম কমিশনারের দয়া বুঝি, কি পরে জানলাম ঐ একই সময়ে আরও বহু জায়গায় বেড়ী কেটে দেওয়া হয়েছে। সাজাহানপুরের কমরেডদেরই খালি বেড়ী কেটে দেওয়া হয়নি। তারা লক্ষ্ণৌএ আসার পর তাদের বেড়ী কেটে দেওয়া হয়।

জেলে আমি গান করতাম। প্রত্যেক জেলের বন্দীরাই গান করতো। যারা জীবনে কখনো গান করেনি নির্জন কারাবাসে তারাও গায়ক হয়ে উঠেছিল। জেলে কি গান গাইতাম, তার বিষয় দু'একটা কথা বলা উচিত। আমার পরের সেলে একজন পাঞ্জাবী ছেলে ছিল। কিশোর ছেলে; জীবনের আনন্দে পূর্ণ। সে ছিল এক সৎ কৃষক বংশ উদ্ভূত। একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত হয়ে সে এসেছিল পূর্বে রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাজের আশায়। বাড়ী থেকে অবশ্য সে কিছু টাকা নিয়েই পালিয়েছিল। ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্যে কাশীতে সে ধরা পড়ে। সে এই গানটা প্রায়ই করতো—
"বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভগবান চান আবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হই।"

প্রায় কয়েক সপ্তাহ পুলিশ আমাদের শান্তিতে থাকতে দিল। অবশ্য আমাদের সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া সম্ভব সবই তারা সংগ্রহ করলো। বিশেষ করে আমাদের মানসিক অবস্থার প্রতিই তারা বেশি নজর দিত। এক সপ্তাহ পরে মিঃ কে. ব্যানার্জি, এক ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদের দেখতে

এলো। সে আমাদের প্রত্যেককে একে একে ডেকে কথাবার্তা বললে। অবশ্য সে নিজের খেলা খেলছিল আর আমরা আমাদের খেলা খেলছিলাম। সে আমাকে আমার কাজ আর মতামত সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা করলো। আমি বললাম যে আমি বিদ্যাপাঠ কলেজের ছাত্র, সাহিত্য আর লেখায় interest আছে। কোন ষড়যন্ত্র বা ষড়যন্ত্রকারীদের বিষিয় কিছুই জানিনা। মিঃ ব্যানার্জি খুব ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু একঘণ্টা কথা বলার পরও কোন খবর না পেয়ে সে আমার ওপর চটে কড়াস্বরে কথাবার্তা বলতে লাগলো। সে বললে যে কাকোরী ট্রেন-ডাকাতিতে যে আমি ছিলাম, সে সম্বন্ধে সে সঠিক খবর পেয়েছে। আমি বহু ডাকাতিতে অংশ নিয়েছি এ খবরও আর তাদের অজানা নয়। শেষ অবধি ভয় দেখিয়ে বললে যে যদি আমি সব কথা না বলি তবে আমাকে ফাঁসী দেওয়া হবে। আমিও ভাবছিলাম। মিঃ ব্যানার্জী এর পরে চলে গেল। এর দু'তিনদিন পরে মিঃ ব্যানার্জী ও আর একজন ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আসতে লাগলো। সে তো প্রত্যহই আসতে লাগলো। তার কথাবলার ভঙ্গী সব সময়েই এক ছিল। প্রথমটা পিতার মতো উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে আরম্ভ করতো আর শেষ করতো ফাঁসীর ভয় দেখিয়ে। সেলে থাকা এত কষ্টকর হয়েছিল যে দুঘণ্টার জন্যে বাইরে যাবার জন্যেও আমি এই কথাবার্তাকে স্বাগত জানাতাম। কিন্তু এটাতেও একঘেয়েমি ধরে গেলো। তাছাড়া রোজ রোজ ভয় দেখানোতে মনে হতো যে হয়তো ফাঁসী হতেও পারে। আমি নিজে ফাঁসী গেছি একথা ভাববার চেষ্টা করতাম। আমি ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করতাম যে কি করে একজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়। সে আমাকে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিত। কি ভয়ঙ্কর এই বিবরণ !! আমি ক্ষুদীরাম, কানাইলাল প্রভৃতি পুরাতন শহীদদের কথা ভাববার চেষ্টা করাতম। সত্যেন চাকীর ফাঁসী যাওয়া অবস্থার ছবিটার কথা ভাববার চেষ্টা করতাম। আমি ক্ষুদীরাম, কানাইলাল, সত্যেন চাকীর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতাম। শুধু ভাবতাম, ফাঁসীর জন্যে নিজেকে তৈরীও যেন করতাম। চারিদিকের পৃথিবী আমার কাছে যেন বদলে গেল। আমি খুব কম ভাবতে লাগলাম। প্রার্থনা করতে লাগলাম

বেশী। এই সময়ে আমি খবর পেলাম যে একটি লোককে ফাঁসী দেওয়া হবে। সেল কম্পাউণ্ডের ঠিক বিপরীত দিকেই ফাঁসীর কম্পাউণ্ড। আর স্নানটানের সময় বাইরে গেলে ঐ ভয়ানক যন্ত্রটার ওপরের অংশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম। কিন্তু আমার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে একটী জীবনচঞ্চল লোককে ফাঁসী দেওয়া হবে এই চিন্তায় ঐ যন্ত্রটা আরও ভীষণ মনে হলো। আমার ঐ সময়ে ঘুম ছুটে গেল। সে রাতে পাতা নড়ার শব্দ হলেও ভাবলাম যেন তাকে ফাঁসীর মঞ্চে আনা হচ্ছে। আমি বারবার কান খাড়া করলাম তার অবরুদ্ধ কান্না শোনবার জন্যে। কিন্তু সেরকম কিছুই শোনা গেল না। আমি নিজেকে ঐ অসহায় লোকটির মতো কল্পনা করতে লাগলাম। আর ভাবতে চেষ্টা করলাল যে কি করে আমি সে সময়ে স্থির থাকবো। আমি কল্পনায় ভাবতে লাগলাম যে আমি আরও বীরের মতো মঞ্চের দিকে এগিয়ে ফাঁসী কাঠে চড়ছি। কিন্তু মনে ভাবলাম যে যেরকম ভাবে আচরণ করা উচিত সত্যি কি সেরকম ভাবে আচরণ করতে পারবো ?

সকাল হলে তারা বললে সে কি রকম বীরত্বের সঙ্গে যে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেছে। ভেঙে পড়েনি, একটা কথাও বলেনি, বিন্দুমাত্র শোক প্রকাশ না করে নিশ্চলভাবে সে ফাঁসীর ফাঁস গ্রহণ করেছে। তারপর পরিদর্শকের একটী মাত্র হুকুমে তার পায়ের তলা থেকে তক্তা সরে গেল, আর হাওয়ায় দুলতে লাগলো তার দেহ। আস্তে একটু কাতর শব্দ একটু ঝুটো-পুটি, তারপর সব নিঃস্তব্ধ। এই বর্ণনায় অদ্ভুত ফল ফললে। ফাঁসী যেতে আর আমার ভয় রইলো না। এই অনুভূতি খুব অস্বাভাবিক। কিন্তু ফাঁসীর জন্যে তৈরী হবার জন্যে এর দরকারও বুঝি আছে। ক্ষুদীরাম, কানাইলাল, কর্তার সিংএর গল্প আমাকে অনুপ্রেরণা দিত। কিন্তু এই লোকটি বোধহয় ভীষণ অপরাধীই হবে, তার গল্প আমাকে আরও অনুপ্রেরণা দিল। কি করে যে শহীদ শেষ দিনের জন্য তৈরী হয় তার গল্প বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেক মামলাতেই প্রস্তুতি পদ্ধতি আলাদা বকম থাকে। আমি এই উপায়ে নিজেকে প্রস্তুত

করলাম। যদিও অল্পবয়সের জন্যে এই ফাঁসী আমার হয়নি, কিন্তু তবুও আমার প্রস্তুতির মনস্তত্ত্বটি বিশ্লেষণের উপযুক্ত বলেই এ-ব্যাপারে এতটা সময় নিলাম।

মিঃ মুখার্জী এসেই আমার সাম্‌নে ফাঁসীর বিভীষিকা তুলে ধরতেন। কিন্তু এতে আমার হাসিই পেতো। বার বার বলতাম যে আমি নির্দোষ, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা। এত জোর দিয়ে বলতাম যে শেষ অবধি মিঃ মুখার্জীও প্রায় এ কথা বিশ্বাস করে ফেললেন। আমি হয়তো সত্যিই নির্দোষ একথা তাঁর মনে উদয় হলো। কিন্তু সরকার ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয় না। তারা একেবারে বাস্তব ঘটনা নিযে কাজ করে। আর যে কোনো দিন ঐ বাস্তব ঘটনা আমার বিপক্ষে যেতে পারে। প্রত্যেক দিনই পুলিশ আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বেশী জানতে পারছিল।

তুমাসের নির্জন কারাবাস ভোগেই আমাদের জেলের জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা এসে গেল। ১৩২১ সালে যখন জেলে গিযেছিলাম তখন কি চমৎকার সময় কেটে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যেন সময় আর কাটতেই চায় না। সরকার সময় নিযে যে কি করতো ভেবেই পেতাম না। কাশীর জেলের শেষের দিকে বই আর একটা খবরের কাগজ দেওয়া হতো। কিন্তু বলেছি, যে, রাতে লণ্ঠন দিতো না। কাজেই নিজের ভাবনার স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু কি বিভীষিকাময ভাবনা। ফাঁসীর দড়ী সর্বদা আমার মনে বিভীষিকার উদয় করতো। আমি শিশু নই তাই বুঝতাম আমার বিপক্ষের অভিযোগটি সহজ নয়।

শুধু পুলিশ আর জেল কর্মচারীই নয়। ম্যাজিস্ট্রেটও ভেবেছিল আমার ফাঁসী হয়ে যাবে। একবার কাশীতে সনাক্ত করার পালায় Mr. Ainuddin আমাকে দেখিয়ে বাবু শ্রীপ্রকাশকে বললেন "আল্লা না করুণ, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় তবে ওর ফাঁসী কেউ আট্‌কাতে পারবে না।" এটা ছিল স্পষ্টভাবেই ভয় দেখাবার ফন্দী। অবশ্য পুলিশ কর্মচারী না বলে ম্যাজিস্ট্রেট বলায় এটা যে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। Mr. Ainuddin এর উদ্দেশ্যও খুবই পরিষ্কার ছিল। কিন্তু এবারে আমি বিশেষ

ঘাবড়ালাম না। কেননা মিঃ মুখার্জী, ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এত বেশীবার এ কথাটা বলেছিলেন যে আমার এতে আর ভয় ছিল না। এতে আমি ফাঁসীর সম্ভাবনায় অভ্যস্থ হয়ে পড়লাম। আমার কল্পনায় আমি শহীদের পর্য্যায়ে উঠে গেছি। এখন তাদের একজন নই বলাটাই আমার কাছে কষ্টকর। মনঃস্তত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এ মনোভাবকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এতে অস্বাভাবিকতা অনেকটা ছিল। কিন্তু অসাধারণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির দরকার হয়। যার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সামনে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি নেই, সে পরিস্থিতিকে ঠিক মতো নিতে পারে না। ধার্মিক আর ধর্মে বিশ্বাসীরা পরজন্মে সুফলের আশায় ধর্মের শহীদ হয়। তেমনি তাঁর আত্মত্যাগে নূতন জগৎ গড়ে উঠ্‌বে এই ধারণায় বীর শহীদ সান্ত্বনা পায়। আমি সে সময় এরকম ভাবতাম বলে আমার কাছে ফাঁসীর সম্ভাবনাটা বেশী ভীতিকর হয়নি।

এই সময় পণ্ডিত হরকারণ নাথ মিত্র আমাদের defend counsel রূপে এসে যখন বললেন যে আমাদের লক্ষ্ণৌ-এ বদলি হবার সম্ভাবনা আছে, তখন আমি খুব খুসী হলাম। কেননা বলা হয়েছিল যে সেখানে আমাদের জেলে রাখা হবে না, রাখা হবে একসঙ্গে কাছাকাছি ব্যারাকে। অবশেষে সেই বাঞ্ছিত দিনটি এলো, আমার বাবা আমাকে দেখতে এলেন। আমার মনে হলো এই যেন শেষ দেখা। ক'ফোঁটা জল আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

বদলি হবার সময় আবার আমাদের পায়ে বেড়ী দেওয়া হলো, আর নিজেদের ঢাকবার জন্যে দেওয়া হলো বোরকা। আমাদের চিনতে পুলিশ যাতে ভুল না করে তারই জন্যে এই সাবধানতা। এই ব্যাপারে তারা এই ছলনা করলো যাতে আমরা ভাবি যে পুলিশ আমাদের অভিযুক্ত করতে চায়, যেন আদালতখানা পুলিশের চেয়ে একবারে আলাদা। যাই হোক্‌ উপদেশ মতো বোরকা তো আমরা লাগালাম। নিশ্চয় আমাদের দেখতে খুব মজার লাগছিল। কেননা স্টেশনে, পৌঁছবামাত্র আমাদের চারিদিকে দর্শকের ভীড় জমে গেল। আমি নিশ্চয়ই জানি যে বহু লোক আমাদের স্ত্রীলোক ভেবেছিল। ভেবেছিল আমরা বোধহয় কিছু দোষ করেছি। যে পুলিশ আমাদের

সঙ্গে যাচ্ছিল, তারা জনসাধারণকে আমাদের সম্বন্ধে এমনকি আমরা স্ত্রীলোক না পুরুষ এ সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা করলো না। তারা খালি চেষ্টা করতে লাগলো দর্শকদের দূরে দাঁড় করিয়ে রাখতে। ফল হলো এই যে দর্শকরা আমাদের স্ত্রীলোক বলে ধরে নিল। আমরা তাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনাও শুনতে লাগলাম। একদিকে এইসব কথাবার্তা আমার ভালোও লাগছিল, আবার অন্যদিকে খারাপও লাগছিল। আমাদের সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান মেয়ে, শুধু তাই কেন সমস্ত উত্তর আর মধ্যভারতের উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের যে সব অসুবিধা, সে সমস্তই ভোগ করতে হচ্ছিল। আমাদের এই বোরখাতে এত অসুবিধা হচ্ছিল যে প্রায় দম আটকে আসার ব্যাপার।

যখন কাশী ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে গাড়ী চড়লাম তখন ভারী বিচলিত হয়ে পড়লাম। বার বার মনে হতে লাগলো যে আর বোধহয় ফিরবো না। কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্যে কি সঞ্চিত আছে। অবশ্য জেলের জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে আমি যেন মুক্তি বোধ করলাম। লক্ষ্ণৌ-এ কি অপেক্ষা করছে কে জানে। সেখানেও কি সেলে রাখবে না সবাইকে একত্র রাখবে। দামোদর শেঠ, যাঁর ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি বললেন যে লক্ষ্ণৌ-এ প্রথমটা বোধহয় আমাদের একত্রে রাখবে, কেননা, তাতে কর্তৃপক্ষেরই লাভ। যাই হোক্ এখন আর আমরা অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভাবলাম না। ভবিষ্যৎ যে বিশেষ উজ্জ্বল নয়, তাতো বুঝতেই পারলাম।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে মামলার শুনানী আরম্ভ হলো। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের সনাক্ত করবার জন্যে যে লোক আনা হলো, তার থেকেই বোঝা গেল যে মামলাটা এখন বেশ কিছু দিন চলবে। কাশীতে নির্জন কারাবাসে আমার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যে একটা অবজ্ঞার ভাব এসেছিল এবার তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল। আবার আমি জীবনের আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লাম। আমি প্রার্থনা কাজটা বন্ধ করে দিলাম। এই দুর্বলতা দূর হওয়া মাত্র প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য নাস্তিক হয়ে উঠ্‌লাম না, কিন্তু ভগবানকে আমি ভুলে গেলাম, তাঁর জন্যে এখন আর আমার সময়ও

ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আমার সহকর্মী আর সহনির্য্যাতিতের সঙ্গে মিশে আমার উৎসাহ আবার ফিরে এলো। ফাঁসী যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও ছিল, কিন্তু আমার সমস্ত মন এবং হৃদয়টা এ-চিন্তা থেকে মুক্ত হল। এখন ফাঁসীকে আর আমরা ভয়ই করতাম না, আমরা ফাঁসীর কথায় হাসতাম, আর তার পরেই সেটা ভুলে যেতাম।

এখানে জীবনটা একটু স্থিতিলাভ করলে মামলাটা আরম্ভ হয়ে গেল, আর আমরা এবার থেকে পড়াশুনোও আরম্ভ করলাম। সেসান কোর্টের প্রযোজন হওয়ায় একটা সিনেমা হল ভাড়া করা হলো। প্রায় চারটে অঙ্কের একটা অর্থ এর জন্যে দিতে হতো। নিম্ন আদালতের শুনানী হতো একটা বড় ঘরে। আদালত ঘরে আমাদের বসবার বেঞ্চি দেওয়া হতো। প্রথমদিন আমাদের হাতকড়ি-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু পরে পুলিশ আপত্তি করায় আমাদের বেড়ী বাঁধা হলো। বেড়ী বাঁধা হতো দশটায় আর খোলা হতো চারটায়। পুলিশের লরী করে আমাদের আদালতখানায় নিয়ে যাওয়া হতো আর, আমাদের লরীর পেছুনে থাকতো সহস্র কনস্টেবলের লরী। চারটে লরী আস্তে আস্তে যাচ্ছে, একটী রোমাঞ্চকর দৃশ্যে অবতারণা হচ্ছে।···জেলের ভিতর আমরা আওয়াজ তুলতাম না, কিন্তু পুলিশের হেপাজতে এসেই আমরা আওয়াজ তুলতে আরম্ভ করতাম, আর জেল থেকে কোর্টে যাবার প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা জাতীয়সঙ্গীত গাইতে গাইতে যেতাম। আমাদের উৎসাহিত করবার জন্যে আমাদের নামবার সময় রোজই আদালত-খানায় বিরাট জনতা জমতো, আর আমরা বিপ্লবী গান গাইতাম। আদালত-খানায় নামবার সময় আমরা রোজ একটা করে নোতুন গান গাইতাম। Indian Daily Telegram আর উর্দু "আগাধ আকবর" এই গানগুলো রোজ ছাপতো।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে লক্ষ্ণৌ-এ বিচারের জন্য আনা হয়। কিন্তু তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায়, আর, তার দীর্ঘ সাজা হওয়ায় তিনি লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রীয় জেলে ছিলেন। কেন্দ্রীয় জেল জেলা জেলের পাশেই ছিল। রাজেনবাবুকে সর্বদা আমাদের থেকে আলাদা রাখা

হতো। অবশ্য পরে যে ছোট দরজাটি কেন্দ্রীয় আর জেলা জেলের সংযুক্ত করেছে তার মধ্য দিয়ে রবিবারে রবিবারে আসবার অনুমতি তাকে দেওয়া হতো। রাজেনবাবুকে সাধারণ অপরাধীর মতো পোষাক পরান হয়েছিল তখন।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার ওপর যবনিকা টানবার আগে একথা উল্লেখ করা দরকার যে রাজেনবাবুর যুক্তপ্রদেশে আসার পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অন্য অপরাধিরা যে কাজ করেছিল ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। একজন রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ জেল দেখতে আসতেন আর আলিপুর জেলের রাজবন্দী আর রাজনৈতিক বন্দীদের জিজ্ঞসাবাদ করতেন। যখন কেউ অভিযুক্ত হয় সে তখন একলাই থাকে, রায়বাহদুর এই tradition এ বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর নিজের পথে বিপ্লবী ছিলেন। কাজেই তিনি প্রাযই রাজবন্দী আর অপরাধিদের দেখতে আসতেন আর তাদের গোপন কথা বার করবার চেষ্টা করতেন। বারবার তিনি আসতেন, আর শোনা গেল যে কিছু সফলতাও তিনি নাকি লাভ করেছেন। ব্যাপারটা, একসময় এমন হলো যে তিনি একজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। ফলে তার বন্ধুদের মধ্যে রাজবন্দীকে সবাই সন্দেহজনক ভাবে দেখতে লাগলো। লোকটি এই সন্দেহ সম্বন্ধে অস্বীকার করলো। কাজেই তার বিরুদ্ধে আড়ালে সবাই আরও বেশী কুৎসা রটনা করতে লাগলো। রায়বাহাদুর তার কাজ করতে লাগলেন। কাজেই দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় অপরাধীরা এর একটা মীমাংসা করবার ঠিক করলেন। একদিন রায়বাহাদুর, তারা যেখানে থাকতো তাদের কম্পাউণ্ডের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা রায়বাহাদুরের ওপর পড়ে তাঁকে বিনা অস্ত্রে হত্যা করলো। অবশ্য মামলায় বলা হয়েছিল যে তারা তাদের মশারীর ডাণ্ডা ব্যবহার করেছিল। রাযবাহাদুরের মৃত্যু হলো। বিচারে দুজনের মৃত্যুদণ্ড হলো। আর অন্যেরা দক্ষিণেশ্বর মামলার জন্যে শাস্তি ছাড়াও অন্যসব শাস্তি পেলো। রাজেন্দ্রবাবুই শুধু একমাত্র অপরাধী যাকে কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত করা হলো না। শচীনদাকে অভিযুক্ত করা হলো। ১৯২৪ সালের বেঙ্গল অর্ডিনেন্স অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। কাজেই তাঁকে ধরা যায়নি। পরে

১৯২৫ সালে তিনি যখন ধরা পড়লেন তখন ১৯২৪ এর ধারা অনুসারে তাঁর বিচার করা হলো। তাঁকে দুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। কাজেই যখন লক্ষ্ণৌ-এ তাঁকে বিচারের জন্য আনা হলো তখন তিনি একজন অপরাধী। তাঁর শাস্তির মেয়াদ অল্প ছিল। তাছাড়া বেশীর ভাগ শাস্তির সময় কেটে গিয়েছিল, কাজেই তাঁকে জেলা জেলে অন্য একটা ব্যারাকে রাখা হলো।

যখন মামলার দৈনিক শুনানী আরম্ভ হবে তখন আমরা বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এই সময় (১৯২৫—২৭) ভারতে মার্কসবাদী সাহিত্যের বিশেষ প্রচার ছিল না, তৎসত্ত্বেও ১৯২৭ সালে চারজন কাকোরী ষড়যন্ত্রের বন্ধুর ফাঁসিতেই অবশ্য আমার ঈশ্বরে-বিশ্বাস প্রভূত পরিমানে কমে গেল।

কাশী আর লক্ষ্ণৌ-এ আমরা বিচারাধীন অবস্থায সাধারণ অপরাধীর মতো ব্যবহার পেতাম। অবশ্য আমাদের নিজেদের বিছানা ছিল, খবরের কাগজ ছিল, কাপড় চোপড ছিল, জুতো ছিল, কিন্তু এসব তো আলাদা জিনিষ। সরকার আমাদের সাধারণ বিচারাধীন বন্দীদের মতো সব জিনিষ দিত, বেশী কিছু নয়। সরকার আমাদের যে খাবার দিত তা' তো মুখে দেবার অনুপযুক্ত। আমাদের একে তো এতে অভ্যাস ছিলনা তার ওপর ভাবতাম যে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে সরকারের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আমাদের উচিৎ-পাওনা। কিন্তু এখানেই ছিল যত গোলমাল। যদিও আমরা ১২১এ ধারা (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা) অনুসারে ধরা পড়েছিলাম তবুও সরকার আমাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। আমাদের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট-এর দীর্ঘ বচসা হয়ে গেল, জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও হলো, কিন্তু তারা তাদের অসহায়ত্ব আর সরকারের আদেশের কথাই আমাদের জানিযে দিল।

জেলের পাঁচিল টপকে পালাবার আর একটা প্ল্যান করা হলো। এইসময় প্ল্যানটি খুব গোপনীয় রাখা হলো। আর যতদূর দরকার হয় তার খবর বাইরের দলকে দেওয়া হলো। জেলের ভেতরে মাত্র বারোজন এই খবর জানতেন। শচীনদা পালাতে চাইলেন না। তিনি ভাবলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী এত অল্প যে হয় তিনি ছাড়া পাবেন নয়তো তাঁর অল্পই শাস্তি

হবে। কাজেই এক্ষেত্রে তাঁর পালান বৃথা। যোগেশবাবু ব্যাপারটায় যোগ দিলেন। শচীনদার মতো কারণ তিনিও দেখাতে পারতেন, কিন্তু তা' করলেন না। আমার মনে হয় এমনি ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে আত্মগোপনকারী হিসাবে ঘুরে বেড়ানোই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। রামপ্রসাদ ছিলেন প্ল্যানটির মাথা। যাঁদের ফাঁসীর সম্ভাবনা ছিল তাঁদেরও এই তালিকায় ধরা হলো। রোশন সিংকে এই তালিকায় ধরা হলো না, কেননা, কেউ ভাবেনি যে তাঁর ফাঁসী হবে। যোগেশবাবু আর রামপ্রসাদ ছাড়া রামকৃষ্ণ ক্ষত্রী আর আমার নাম তালিকায় দেওয়া হলো। কেন্দ্রীয় জেলে আসার দরুণ রাজেন্দ্র লাহিড়ী এ-ব্যাপারে যোগ দিতে পারলেন না। এই ভাবে প্ল্যানটাকে কার্যকরী করা হলে—বাইরে থেকে ক্লোয়াল বে-আইনী আনা হবে ঠিক্ হলো, সেটা আমাদের সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে রক্ষীদের দেওযা হবে। ক্লোযাল হলো এক রকম মাদক দ্রব্য। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা বেরিয়ে যাবো এবং দেওয়াল টপকাবো। কিছুদিনের জন্যে প্ল্যানটা মাটী হযে গেল কেননা আদালতে ওটা দেবার সময ধরা পড়ে গেল।

ঠিক্ এই সমযে আমাদের প্রেরিত আবেদন নাকচ হয়ে গেল। লোকে আইন সম্বন্ধে তিতি বিরক্ত হযে উঠেছিল, নিজেদের হাতে আইনের ভার নেওযার সম্ভাবনাতেও তারা বিরক্ত হযে উঠেছিল। কাজেই এইবার অনশনের কথা উঠলো। বড় থেকে ছোট সবাই লড়াই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। Defence council এর জন্যে পরামর্শ করা হলো। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে এর বিপক্ষে ছিলেন। বাবু মোহনলাল সাকসেনা এর এত বিরোধী ছিলেন যে তিনি বললেন আমাদের পরাজয় নির্দ্ধারিত। আরও বললেন যে এতে কোনই ফল হবেনা। তিনি এত দৃঢ় ছিলেন যে মাঝে আমাদেরও মনে একবার ভয় হয়েছিল যে হয়তো সত্যিই কিছুই হবে না। কিন্তু তবুও আমরা ধর্মঘট করবার ঠিক্ করলাম। আমরা রাজনৈতিক বন্দী কাজেই শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের চেয়েও ভালো ব্যবহার আমাদের পাওযা উচিত বলে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। এটা খুবই লজ্জা আর অসম্মানের কথা যে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীরা শুধু ভারতীয় অপরাধীদের চেয়ে নয়, শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক বন্দীদের চেয়েও ভালো

ব্যবহার পায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিশেষ ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু এই বিভাগ আন্দোলনের দিন অবধি স্থায়ী ছিল। কিন্তু এর পরে গনেশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো লোক যিনি "প্রতাপে" একটা প্রবন্ধ লিখে অভিযুক্ত হন, তাঁকেও সাধারণ, অপরাধীদের মতো ব্যবহার করা হতো, জাঙ্গিয়া আর কুর্তা পরান হতো।

অনশনের জন্যে সমস্ত আয়োজন করা হলো। প্রেসে আমাদের আবেদনের একটা খসড়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে আমাদের বন্ধু গণেশ বিদ্যার্থী আমাদের এই নোতুন কাজের কথা জানতেন। তিনি নিজে সরকারের জাতিগত-বিভেদ পন্থায় ভুক্তভোগী ছিলেন, আর ছিলেন হিন্দী সাংবাদিকের প্রধান। কাজেই তাঁর মতো উপযোগী আর কে হবেন? সমস্ত আয়োজন হয়ে গেলে আমরা অনশন আরম্ভ করলাম। ডাক্তারের মতানুসারে রাজেন্দ্র লাহিড়ী অনশন থেকে বাদ পড়ে গেলেন। তা'ছাড়া তিনি পরিষ্কার বললেন যে তিনি গুলি করতে পারেন, গুলি খেতেও পারেন, কিন্তু অনশন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! হরগোবিন্দ ধর্মঘটে যোগ দেননি, কিন্তু তিনি বললেন যে এটাকে সফল করার জন্য তিনি সাহায্য করবেন। আমরা অনশন আরম্ভ করা মাত্র জেলের কর্মচারিদের আমাদের প্রতি ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। আগে আমাদের সঙ্গে তারা ভালো ব্যবহারই করতেন কিন্তু আমরা অনশন আরম্ভ করামাত্র আমাদের নূতন অফিসার cap হাজী সালামায়ুল্লার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি গম্ভীরস্বরে আমাদের উপদেশ দিয়ে একটী বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু তাতে আমরা অনশন ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় তারা আমাদের জেলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দিল। আমাকে সেলে পাঠান হলো। লক্ষ্ণৌ-এর সেল সত্যিই পৃথিবীর নরক। কাশীতেও জেলে আমি কিছুদিন থেকেছি কিন্তু এবার লক্ষ্ণৌ-এর জেলে আমাকে রেখে লৌহদরজাটী-বন্ধ করা মাত্র আমার মনে হলো বিরাট একটা হাত যেন আমাকে সকলের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিল। মানুষের জগৎ কি এত ছোট হতে পারে? একমুহূর্তের জন্য মনে হলো সাহায্যের জন্য চেঁচাই। কিন্তু তখনই বুঝলাম যে আমি মানবসমাজের বাইরে এসে পড়েছি। আমি নিজেকে অত্যন্ত অসহায়

বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু ভাবলাম যে আমি তো নিজেকে সব কষ্টের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি এও ভাবলাম যে এখনই তো আমি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারি। আমাকে খালি বলতে হবে "আমি খাব"। আমি যে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে সমস্ত বিপদকে বরণ করেছি, এ চিন্তায় আমি আরাম পেলাম। আমি মেঝেতে বসে পড়ে' নিজেকে সাহস দিতে লাগলাম। জেলে একটা ছোট্ট জান্‌লা ছিল, মাটী থেকে ওটা দু'ফিট্। কিন্তু নিয়তির মতো সুদৃঢ় একটা প্রাচীর তার সামনে থাকায় আমি আকাশ দেখতে পেতাম না।

চতুর্থদিনে শচীনদার ছোট ভাই ভূপেন অনশন ত্যাগ করলো। তাকে শ্বেতাঙ্গদের ব্যারাকে পাঠিয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হলো। মুকুন্দলালজী হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। সপ্তমদিনে তিনি অনশন ত্যাগ করেন কিন্তু বাকীরা শেষ অবধি অনশন করেছিল। দুবলীশজার এই সময়েই খুব বেশী জ্বর হয়, জ্বরে তিনি অচেতন হয়ে পড়লে রাতে তারা তাঁকে দুধ খাওয়াত। তিনি যখন বুঝলেন যে তাঁকে নিয়ে কি করা হয়েছে তখন তিনি চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন। অচেতন অবস্থায় তাঁকে এমনি করায় ডাক্তার আর জেলারকে গাল দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর অনশন তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন। হাজী ভীষণ রেগে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। সপ্তমদিনে সবার ওপর জোর করে খাওয়ানো চললো।

এখানে জোর করে খাওয়ানোর পদ্ধতি বর্ণনা করাটা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। লোকটাকে দরকার মতো আট দশ জন চেপে ধরতো, তারপর তাকে মেঝের ওপর ফেলে তার নাকে রবারের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। নাকের মধ্যে একটা ঘাস ঢুকলেও মানুষ তার অস্বস্তিকর অনুভূতি জানে, কি রকম ভীষণ সুড়সুড়ি নাকে যে লাগে তা কারোর অজানা নয়। মনে হয় যেন দম আটকে এলো। দুবলিশজীর বেলায় তারা আবার একটা আরও মোটা টিউব ঢুকাতো, তাতে আরও মুস্কিল হতো। হাজী তাঁকে ভেবেছিলেন তিনি বুঝি অনশন ত্যাগ করেছেন, কিন্তু আবার আরম্ভ করায় (সত্যই তিনি

অনশন ত্যাগ করেন নি, অচেতন অবস্থায় তাঁকে খাওয়ানো হয়েছিল) হাজী তাঁকে শিক্ষা দিতে চাইলেন। অবশ্য তাঁর যে তাতে বিশেষ কিছু শিক্ষা হয়েছিল তা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি।

এগার দিনের দিন প্রাদেশিক সরকার আমাদের সম্বন্ধে একটা সংবাদ (communique) বার করলেন। একটা আমাদের দেখান হলো। এবার সেল থেকে আমাকে সরিয়ে আর একটা ব্যারাকে রাখা হলো। সেখানে তিন চার জন অনশনকারী ছিল। পরিদর্শক এসে আমাদের ঐ সংবাদটি পড়ে শোনাল। এতে সরকার কি অবস্থায় আমরা ধরা পড়েছি বর্ণনা করে বলেছে যে আমাদের দোষ এত বেশী যে আমাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে ধরা যায় না, কাজেই, বিশেষ ব্যবহারের কথাই ওঠে না। জনসাধারণের দরদ আমাদের প্রতি যাতে আকৃষ্ট না হয় তার জন্য বলা হল যে অনশনের কষ্ট কমাবার জন্যে আমরা জেলে ক্লোরাল আনাবার চেষ্টা করেছিলাম। এটা ভেবে আমার ভারী অস্বোয়াস্তি লাগতে লাগলো, মনে হতে লাগলো যে জনসাধারণ এটা হয়তো বিশ্বাস করতেও পারে। অবশ্য ক্লোরাল আনার এই ব্যাখ্যায় আমরা বুঝতে পারলাম যে ঐ উপায়ে পালাবার সুযোগ একেবারে শেষ হয়নি। আমি পাঠকদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে এগার নম্বরের লোহার ডাণ্ডার কয়েকটা আমরা সরিয়ে ফেলেছিলাম। সেটাও কেউ লক্ষ্য করেনি। কাজেই আমরা আমাদের পালানোর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আবার উৎসাহী হয়ে পড়লাম।

হাজী সংবাদটা পড়বার সময় ভাবলো যে সরকারের communique আমাদের বুঝি খুবই হতাশ করবে। আর, এবার বুঝি আমাদের তার কথা শোনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। ঐ কাগজটা থেকে সে একটা ম্যাজিকের আশা করছিল। আমরা কিন্তু ঐটাতে বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না, অবশ্য বোঝা গেল যে সরকার সহজে নামবে না।

লম্বা গল্পটাকে সংক্ষেপে করার জন্যে বলা যায় যে আমরা অনশন করতে লাগলাম। জাতীয়বাদী কাগজগুলো আমাদের খুবই সাহায্য করতে লাগলো। ভারতের ইতিহাসে কখনও এত রাজনৈতিক বন্দী বিশেষ

ব্যবহারের জন্যে অনশন করেনি। অবশ্য মহান্ রামরাজ আর অন্যেরা লড়েছিলেন, আর রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দামানে মারাও গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে বিশেষ ব্যবহার দাবী করেন নি। তাই আমাদের অনশনের একটা ঐতিহাসিকতা ছিল। প্রতাপ আর গনেশ বিদ্যার্থী আমাদের আশা মতো ঐ ব্যাপারটায় বিশেষ জোর দিতেন। মহান্ রামরাজ হিন্দু সাংবাদিকদের গুরু আর সে সময়ে বেশ নাম করা কংগ্রেসকর্মি ছিলেন। কাজেই তাঁর প্রভাবও বিশেষ ছিল। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী সচেতনভাবে নীরব ছিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের সমস্ত প্রেস আমাদের সমর্থন করতেন। জাতীয়তাবাদী কাগজের প্রভাব সরকারের ওপরও পড়েছিল। তা'ছাড়া সরকার আমাদের মামলাটা চট করে শেষ করতে চাইছিল। সরকারের ঐ মামলার জন্যে দিনে প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হচ্ছিল এবং ইতিমধ্যেই ছয় সাত লাখ্ টাকা খরচও হয়েছিল। সাধারণ মামলার দিনে যা খরচ হতো অনশনের দিনেও সরকারের সেই খরচই হচ্ছিল। এতে সরকারের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। একে এই খরচ তার ওপর আমাদের অনশন ভাঙার কোনো লক্ষণই ছিল না। এই দুই ব্যাপার একত্র করে সরকার ভারি ভাবিত হয়ে পড়লো। বিচারক Mr. Hamilton-এর সঙ্গে শচীনদার কথাবার্তা হলো। হাজি পণ্ডিত রামপ্রসাদের সঙ্গে কথা বললো, আমাদের defence counselও আমাদের বোঝাতে লাগলো।

ষোলো দিনে আবদুর সকুর আমাকে কেন্দ্রীয় জেলে নিয়ে যাবার জন্যে এলো। আমাকে কেন ডাকা হয়েছে আমি কিছুই জানতাম না। এইভাবে পণ্ডিত রামপ্রসাদ, শচীনদা, যোগেশবাবু প্রভৃতিকেও ডাকা হলো। একটা বৈঠকের মতো হলো। এখানে আমি ছিলাম ছোটদের প্রতিনিধি। মনে হলো একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। হাজী শ্বেতাঙ্গদের সমান ব্যয় করতে রাজী ছিলো। কিন্তু সেটা মাত্র স্বাস্থ্যের খাতিরে। বোঝাই গেল, medical ground অর্থাৎ "স্বাস্থ্যের জন্য" কথাটা সরকারের সম্মান বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে! সরকারের কাছে মর্যাদাই হলো সবচেয়ে বড় জিনিষ। কিন্তু

এ সময়ে তার আচরণে এমন কিছু ছিল যেটা আমরা বুঝতে পারিনি। পণ্ডিত রামপ্রসাদ, ষোলো দিনের অনশনের পরেও, জোর করে খাওয়ানোর জোরে তিনি তখনও একেবারে তাগড়া ছিলেন, তাঁর জন্যে কি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে টাকা দেওয়া সম্ভব? সবাই বুঝলো যে medical ground কথাটায় কোনো গোলমাল আছে। কিন্তু প্রথম বিজয় হিসাবে এটাই যথেষ্ট। এর পরে খাওয়ার জন্য টাকা বাড়ানর কথা নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর অনশন ত্যাগ করা হলো। এক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় জেলের কমরেড্ ছাড়া সবাই একটা ব্যারাকে একত্রিত হলাম। ঐ রাতেই তাদের আনার কয়েকটা বাধা ছিল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গরম দুধ পান করলাম। পরের দিন সকালে সমস্ত অনশনকারী বন্ধুদের এই ব্যারাকে আনা হলো। এই ভাবে কাকোরী বন্দীরা অনশনে তাদের প্রথম বিজয় লাভ করলো।

মামলাটি চললো প্রায় আঠারো মাস। ১৯২৭ সালের জানুয়ারীতে মামলাটি শেষ হয়ে এলো। আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে এটা শেষ হয়ে আসছে। দুটো পরস্পরবিরোধী ভাবধারা আমার মনের মধ্যে কাজ করছিল। মন একবার চাইছিল বিচারের দিনটা দূরে সরে থাক্, কেননা বুঝতেই পারছিলাম যে বিচারটা খুব আনন্দদায়ক হবে না। মন আবার চাইছিল: যথেষ্ট হয়েছে, যা হবার হয়ে যাক।

যাঁরা ডাকাতি আর হত্যার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আসল মামলায় মাত্র পণ্ডিত রামপ্রসাদ আর আমিই দু'তিনটে ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত ছিলাম। মুকুন্দি লালজী, রোশন সিং রাজেন লাহিড়ী, রাজকুমার সিংহ, গোবিন্দচরণ কর, রামকৃষ্ণ ছত্রী প্রভৃতি একটা করে মামলার জন্যে দায়ী ছিলেন। অবশ্য আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ডাকাতি ছিল না। সব সাক্ষীদের দিয়ে প্রমাণ করান হয়েছিল যে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল বড় অভিযোগ। পরে

মিঃ হ্যামিলটন এই মামলাটাকে বলেছিলেন কাকোরী বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা; কাকোরী ডাকাতি মামলা নয়। এটা তিনি অনায়াসে করতে পারতেন আর আমাদের তো কিছুই বলবার ছিল না। শাস্তির আলোচনার সময় আমরা ষড়যন্ত্র কথাটা কখনও ভাবতাম না, কেননা, বিপ্লবী-ষড়যন্ত্র করার শাস্তি হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এই ব্যাপারে আমরা শুধু ডাকাতির অভিযোগের কথাই ভাবতাম। এইদিক দিয়ে আমরা ঠিক জানতাম যে পণ্ডিত রামের ফাঁসী হবে। তিনি শুধু ডাকাতি করেননি, ডাকাতির নেতাও ছিলেন তিনি। তিনিই এগুলো পরিচালনা করতেন। আইনের ফাইলে কাকোরী মামলা ছিল সম্রাট বনাম পণ্ডিত রাম আর অন্যরা। যদি আরোও কারো ফাঁসী হয় তবে ভাববার বিষয় কে ঐ সম্মানের অধিকারী হবে। লোকেরা দু'জনের নাম করতো: একজন রাজেন লাহিড়ী অন্যজনা হলো আমি।

মার্চে মামলাটা প্রায় শেষ হলো। এবার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি দেবার পালা এলো। আমার মনে হয় বিবৃতি দেওয়াটা খুব সম্মানজনক নয়, কেননা সেগুলো আইনসঙ্গতভাবে তৈরী বিবৃতি, তাতে মামলার defence-এর জন্যই চেষ্টা ছিল। আদর্শের বা মামলার উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যেত না তার মধ্যে। বিচারক আগেই প্রত্যেকের জন্যে প্রশ্ন তৈরী করে রেখেছিলেন। এক এক করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো। আর আমাদের তার উত্তর দিতে বলা হলো! এই বিবৃতি আমি একেবারে ভুলে গেছি। এর জন্য দুঃখও আমি করি না। কেননা ওতে যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না তা আমার বেশ মনে আছে। Daily Indian Telegram আর Awadh Akbar রোজ ঐগুলির সারাংশ যত্ন করে বার করতো।

১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল অন্যসব দিনগুলোর মতোই একটা দিন, কিন্তু ঐ দিনটি ভারতের বিপ্লবীদের জীবনের একটা বিশেষ দিন। আমরা সেদিন খুব ভোরেই উঠলাম, কেননা আমাদের আদালতে যাবার জন্যে দশটার মধ্যেই তৈরী হতে বলা হয়েছিল। সকাল থেকেই জেলের রাঁধুনিরা ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমরা সবাই নিয়ম মত ব্যায়াম করলাম, তারপর স্নান করলাম।

কিন্তু সাধারণ কাজের মধ্যেও অসাধারণ কিছু ছিল। কেউ বিষণ্ণ ছিল না, সবাই ঠাট্টা করছিল, কিন্তু তবুও বোঝা যাচ্ছিল যে একটা অসাধারণ কিছু ঘটছে। দশটার সময় খাবার তৈরী হলো, নায়েব সাহেব আবদুর সাকুর রোজকার মতো আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে তাড়া দিতে লাগলেন। এই চৌদ্দ পনের মাস তিনি এসে আমাদের কারুর বিছানায় শুয়ে দাবা খেলতেন বা রামদুলালের গান শুনতেন। কিন্তু আজ তাঁর বসবার কোনো জায়গা ছিল না। সব বিছানা গুটিয়ে ফেলে পরিষ্কারভাবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। দেওয়ালের ছবি, ক্যালেণ্ডার, বাক্স, পোর্টম্যানটো, আর স্যুটকেশ সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। যে ব্যারকটা এত মাস বোর্ডিং বাড়ীর মতো দেখাতো আজ তা নিঃস্তব্ধ আর শ্রীহীন দেখাচ্ছে। নায়েবের মেজাজ খুব খারাপ ছিল। তিনি আর আমাদের বন্ধু নন! আমরা জানতাম যে তিনি আমাদের খবর পুলিশে গিয়ে দিয়ে আসেন, জেল সুপারকেও দেন। অবশ্য আমাদের তিনি পুলিশের আর কারাগার সম্বন্ধে কয়েকটা মূল্যবান খবর দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর এই চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতাম। আজ কিন্তু বসবার জন্যে তাঁকে একটা ভালো জায়গা খুঁজতে দেখে তাঁর ওপর আমার বড় মায়া হলো। মনে হলো তিনিও যেন আমাদের একজন। আজ যেন তাঁর কাছ থেকে আর অন্য সব কমরেড-দের কাছ থেকে দূরে সরে যাব। আমার মনে হয়, তাঁর মনেও খানিকটা ঐ ভাব এসেছিল। তাঁকে একটু চুপচাপ দেখাচ্ছিল। রোজ তিনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি করতেন, কেউ তাঁর ঘড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতো। কিন্তু আজ তিনি আর আমরা সহসা যেন নিজের রাস্তা দেখতে পেয়েছি। তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন যে যতই হোক আমরা বন্দী। আমরাও বুঝেছি যে যতই হোক তিনি জেলার। দুপক্ষের কেউই এই আবিষ্কারে খুশী হইনি! দুপক্ষই দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু সত্যঘটনা সর্বদা সত্য ঘটনাই···শ্রদ্ধা করে চলতেই হবে।

নায়েব বললেন যে ইতিমধ্যে পুলিশের কাছ থেকে দুবার ফোনে তিনি খবর পেয়েছেন আমাদের পাঠিয়ে দেবার জন্যে। বোধহয় এটা তাঁর সাধারণ মিথ্যার

মধ্যে একটা। কিন্তু তবু আমরা খাবার জন্যে তৈরী হলাম। সাধারণ ভাবে সবাই খেয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একজনের মনে হলো যে আজ আমাদের বিশেষ রকম খাওয়া দরকার। কাজেই রায়বাহাদুর চম্পালালের বাড়ী থেকে একটা বিরাট থালা আনান হলো। খাবার ঐ থালায় সাজিয়ে দেওয়া হল। সবাই ঐ থালা নিয়ে বসলো। আর যারা জায়গা পেলে না, তারা দাঁড়িয়ে দু'চার গ্রাস ঐ থালা থেকে খেয়ে নিল। শেষ মুহূর্তে বোধহয় পণ্ডিত রামপ্রসাদের মাথা থেকে ঐ প্ল্যানটা বেরিয়ে ছিল। এই ব্যাপারটায় আমাদের অনুভূতির এত সাক্ষাৎ প্রকাশ ছিল যে আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলাম। পুরাতন যুগে এই উৎসব করে খাওয়া মানুষের ইতিহাসে একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে। কি করে যে এই মুহূর্তে আপনি থেকে আমাদের মাথায় এই ধারণা এলো সেটা ভারী আশ্চর্যের কথা। বহু বছর এই খাওয়ার কথাটা আমার মনে ছিল।

আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো পোষাক পরে নিলাম। এটাও সব দেশের লোকের একটা নিয়ম। হলদিঘাটে রাজপুতবীরেরা গিয়েছিল তাদের শ্রেষ্ঠ পোষাক পরে। রাজপুত রমণীরা চিতারোহন করতেন শ্রেষ্ঠ পোষাকে। ঠাকুর রোশন সিং তাঁর গোলাপের আতর বার করে সবার গায়ে লাগিয়ে দিলেন, তিনি নিজেও চমৎকার পোষাক পরেছিলেন।

বেড়ী বাঁধার সময় হলো। আগেই লিখেছি যে আদালতে যাবার সময় আমাদের পায়ে বেড়ী বাঁধা হতো। ফিরে এলে কেটে দেওয়া হতো। কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু নায়েব আজ এগুলো ভালো করে পরীক্ষা করতে বললেন। তিনি জেল থেকে আনা চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ কমরেড্‌দের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি বেড়ী বাঁধা অবস্থায় ছিলাম বলে সে জায়গায় যেতে পারলাম না। কিন্তু হঠাৎ রাজকুমার, যার সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, আমাকে জড়িয়ে ধরলো, যেন আলিঙ্গন করতে চায়। আমি তাকে তার খুসী মতো যা ইচ্ছে তাই করতে দিলাম। কি কি ঘটেছে ভেবে আমি অবাক হলাম। আমায় তখন বেড়ী বাঁধা হোল আর আবদুর সাকুর যাতে শুনতে না পায় এমন দূরে গিয়ে

ভাবতে লাগলাম: কেন সে হঠাৎ মেয়েদের মতো ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলো। বহুকষ্টে আমি খবর জোগাড় করলাম যে Mr. Hamilton বা অন্য কারুর কাছ থেকে তিনটে ফাঁসীর কারাগার প্রস্তুত রাখবার জন্যে খবর এসেছে। কাজেই, বন্ধুদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। রাজকুমার আমার কাছে এসেছিল কারণ সে ভেবেছিল যে তিনজনের মধ্যে অবশ্যই আমি একজন যার ফাঁসী হবে। আমি অবশ্য বুঝলাম যে আমাদের কল্পনা করবার সুবিধার জন্যে বন্দীটি ঐ খবর এনেছে, এ খবর সত্য হতে পারে না। যদি তিনজনের মৃত্যুদণ্ডই হয় তবেই বা কেন আদালত এর জন্যে জেল কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থা রাখবে। আমি যন্ত্রের মতো এগুলো বলে গেলেও মনে মনে খবরটা খানিকটা বিশ্বাস করে ফেললাম।

খাওয়া আর বেড়ী বাঁধার পর আমরা জেলে যাত্রা করলাম। আমরা দুটো পুলিশের গাড়ীতে চেপে বসলাম। সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী একটা আগে আর একটা পরে যেতে লাগলো। একটা শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টের হাতে একটা রিভলভারও ছিল। যদিও একজন ভারতীয় সুবাদারই এই সশস্ত্র গাড়ীগুলোকে চালাত তবুও একটা শ্বেতাঙ্গ সুবাদার আইনতঃ তার কোন দায়িত্ব না থাকলেও—ছিল সবার উপরে। সুবাদারই সমস্ত কাগজপত্রে সই করতো আর আমাদের নিয়েও যেত আবার ফিরিয়েও আনতো। কেন্দ্রীয় জেলে তখন রাজেন্দ্র লাহিড়ী যোগ দিলেন। তিনি সাধারণতঃ যেমন শিশুর মতো হেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতেন আজও তাই জানালেন। তিনিই খালি জেলের অপরাধীর পোষাক পরেছিলেন—কেন না শচীনদা অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ব্যারাকে বেসামরিক পোষাকে থাকতেন? রোজ রাজেন লাহিড়ী হয় হেসে নয়তো হাত নেড়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতেন। কিন্তু আজ সবাই তাঁকে জড়িয়ে ধরে সম্বর্ধনা জানালো। রোশন সিং তাঁর গোলাপের আতর এনেছিলেন—রাজেনের অপরাধীর পোষাকে খুব করে সেটা লাগিয়ে দিলেন। রাজেনবাবুর গাড়ীতে সাধারণ যুবকরা যেত, আজও তাই করা হলো। যখন গাড়ী ছাড়লো—আমরা রোজকার মতো বিপ্লবীগান আরম্ভ করলাম, কিন্তু আজ আমাদের গানের মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ছিল। আমরা

নিজেরাও অনুভব করতে লাগলাম। আমরা অনুভব করলাম যে আমরা যেন ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। আদালতের কাছে ভিড় দেখে আমরা আমাদের আওয়াজ তুললাম "ভারতীয় প্রজাতন্ত্র কী জয়"। সেই সময় পথে হঠাৎ আমরা একটা মাল-বোঝাই গাড়ী দেখলাম। একটা করে লেবেল সব বাক্সে লাগান ছিল, আমরা যখন একটা লেবেল পড়লাম তখন আমাদের বিস্ময় কল্পনা করুন। লেবেলে আমাদের বিচারকের নাম লেখা ছিল। রায় দেবার পরই আমাদের বিচারক চলেছিলেন ভারত ছেড়ে ছুটি ভোগ করতে। এটা দেখে আমরা বুঝলাম যে আমাদের দেশের লোকদের সরকার এখনও কত ভয় করে। আদালতখানায় পৌঁছে আমরা পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত দেখলাম। বহু শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাছাড়া লক্ষ্ণৌ-এর বোধ হয় সমস্ত পুলিশকেই সেখানে আনা হয়েছিল। আমরা বুঝতেই পারলাম যে কেন এত আয়োজন।

আদালতের বাইরের মাঠে বহু লোক জমা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারের তুলনায় বিশেষ ভীড় হয়নি। লক্ষ্ণৌএর জনতা এ মামলায় বিশেষ মনোযোগ দেয় নি কিন্তু আজ তবুও বহুলোক এসেছিল। লরি থেকে আমরা নামবার সময় ভিড়ের চারিদিকে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। লোকেরা জানতে চাইছিল যে কে কোনটা। অন্যদিনের মতো আমরা তক্ষুনি ঘরে ঢুকলাম না। আমরা দাঁড়িয়ে এই গানটা করতে লাগলাম—

"সব ফরোমী কী তমন্না
যব হামারে দিলমে হৈ
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা"

এই গানটা গাইবার সময় আমরা ধীরে ধীরে আদালত-গৃহে প্রবেশ করলাম। আগের দিনের মতো আদালত ঘরের বাইরেই গান থামালাম না, আদালতখানার ভেতরেও গান গাইতে গাইতে গেলাম। সিনেমা হল আমাদের গানের সুরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। এই গানের ঐতিহাসিকতা আরও বেড়েছে এই জন্যে যে রাজনারায়ণ ১৯৪২এর প্রথম শহীদ এই গানটি গাইতে গাইতে ফাঁসির দড়ি বরণ করেছে। শেষে আমরা থামলাম। ফরিয়াদী

আর আসামী দুই পক্ষের লোকেরাই সেখানে হাজির ছিল। তা ছাড়া কয়েকজনা বেশি আইনজীবিও ছিলেন। আমাদের defence counsel কে ঐ আইনজীবির মতো লাগছিল না। সমস্ত আইনজীবিরা মামলাটির শেষ দেখতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আমাদের আইনজীবিরা যেন নিজেদেরই অপরাধী বলে ভাবছিল আর যেন মনে হচ্ছিল শাস্তিটা তাদেরই পাওয়া। রাজসাক্ষী বানোয়ারী আর ইন্দুভূষণও উপস্থিত ছিল। বানোয়ারীকে এই প্রথম একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ইন্দু আগের মতোই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই তারা নিরাপদ। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে আমরা জানি না। আমাদের মধ্যে কেউ কি ওদের স্থান নিতে চায়? না মোটেই নয়। পৃথিবীর বদলেও না। আমরা বারবার ফাঁসীর দড়ি বরণ করতে পারি, কিন্তু তাদের মতো হতে চাই না। আমাদের আত্মীয়রা নিকটে ছিলেন কিন্তু তবুও আমাদের মনে হচ্ছিল যে বোধহয় আমরা আর এই অপরাধীরা নিজেদের রক্ত-সম্পর্কিতদের চেয়ে পরস্পরের বেশি আপনার।

বিচারপতি এলেন। মনে হলো যেন, তিনি নিজেই সাক্ষাৎ নিয়তি। মনে হলো তিনি যেন খানিকটা রোগা হয়ে গেছেন। তাঁরও কি কোন ভাবাবেগ ছিল? যদি তাই হতো তবে তিনি অন্য হুকুম দিতেন। সরকার কিছু আশা করেই তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, সে আশা আজ তিনি পূর্ণ করতে যাচ্ছেন। যখন তিনি তাঁর আসনে বসে রায় পড়তে লাগলেন তখন চতুর্দিকে ভীষণ নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। নিবিড় সেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যে কেবল বিচারপতির কণ্ঠস্বরই শোনা যাচ্ছিল।

প্রত্যেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলেন। বিচারপতি কয়েক লাইনে ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি বর্ণনা করলেন। তিনি সব রায়টা পড়লেন না। কেননা রায়টা ছিল ফুলস্কেপ কাগজের ১৫৫ পৃষ্ঠা। মাত্র সারাংশটা পড়লেন। এই সাধারণ মন্তব্যের পর তিনি শাস্তির বিবরণ দিলেন। তিনি অক্ষর অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম দিয়েছিলেন। এ ভাবে প্রথম নাম ছিল ভূপেন সান্ন্যালের। তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো, তখন আমাদের শাস্তির মাত্রাটা আমরা কল্পনা করে নিলাম। তবুও আশা ছিল। সংক্ষেপে তিনি

তিনজনের মৃত্যুদণ্ড দিলেন—রামপ্রসাদ বিশমীল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী আর রোশন সিং। শচীনদার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো, আমার হলো চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, মুকুন্দি লালজী রামকৃষ্ণ ছত্রী, রাজকুমার সিং-এর প্রত্যেকের তের বৎসর করে' সশ্রম কারাদণ্ড হলো। সুরেশ ভট্টাচার্য আর বিষ্ণুসরণ তুবলীদের সাত বছর, প্রেমকিষেন আর রামতুলাল ত্রিবেদীর পাঁচ বছর, প্রণবেশের চার বছর, সশ্রম কারাদণ্ড হলো। আমার মনে হয় বানোয়ারীরও ঐ চার বছর কারাদণ্ড হলো।

আমরা নিজের কারাদণ্ডের কথা ভুলে গিয়ে যে কমরেডদের চিরদিনের মতো চলে যেতে হবে তাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালাম। রাজেনবাবুর শাস্তি যখন উচ্চারিত হলো তখন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সাহসী, তবুও শাস্তিটা শোনবার পর বললেন, "তুনিয়াটা যেন বদলে গেল"। পরমুহূর্তে তিনি শিশুর মতো হেসে আমার হাতটা চেপে ধরলেন। সত্যিই, তুনিয়াটা বদলে গেছে। আমরা, যখন রায় উচ্চারিত হবে—তখনকার অবস্থাটা আগেই কল্পনা করতাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। আজ সে দিনের কথাটা ভাবলে মনে হয় যখন শাস্তি উচ্চারিত হচ্ছিল তখন বোধহয় আমরা সব ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আমার মনে হলো পৃথিবী যেন সম্বিৎ হারিয়েছে। আমার ঐ অবস্থাটা বোধহয় অনেকদিন ছিল। আমার কথা আর কাজের কিছু তারতম্য ঘটলো না, কিন্তু সেগুলো আমি অজান্তে অভ্যাসের বশে করেছিলাম। রামপ্রসাদ একটুও মুখ বিকৃতি না করে শাস্তিটা গ্রহণ করলেন। রোশান সিং-এর পক্ষে শাস্তিটা ছিল অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু তিনি এটা সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু 'ওম্ ওম্' বললেন। এটা তাঁর অভ্যাস ছিল। কিন্তু এ সময়ে এটা বড় মর্মান্তিক বোধ হলো। তিনি যেখানে আমি, রাজেন্দ্র লাহিড়ী আর আর সকলে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে এলেন। সবাইকে তিনি বললেন, "আমার জীবন আমি উপভোগ করেছি, কাজেই ফাঁসী গেলে আমার কোন ক্ষতি নেই কিন্তু তোমরা যে জীবনের কিছুই দেখলে না"। তারপর এলো রাজেনবাবুর

পালা, তিনি বললেন, "আমার কষ্ট তো অল্পস্থায়ী, ক'মাস পরে আমার কষ্টের পালা শেষ হবে, কিন্তু আমি ভাবছি তাদেরই কথা যাদের জেলে কাটাতে হবে সুদীর্ঘ ষোল বছর বা বিশ বছর"। এসব কথা গৃহের কল্যাণ-ছায়ায় বসে তাঁরা করেন নি, করেছিলেন ফাঁসীর দড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। এইসব লোকেরাই ভারতের বিপ্লব ইতিহাসকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন, উজ্জ্বল করে গেছেন।

শাস্তি উচ্চারিত হওয়ামাত্রই পুলিশ আমাদের সরিয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। যাদের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল তাদের জন্যে আবার তাদের মাথা ব্যথা একটু বেশী ছিল। অবশ্য আমাদের জেলে ফেরবার বিশেষ তাড়া ছিল না। আমরা বুঝলাম যে বহু বছরের জন্যে এইটাই হলো পৃথিবীকে শেষ দেখে নেওয়া, আর কয়েকজনের তো এই-ই শেষ। শচীনদা আর কয়েকজন আইনজীবিদের সঙ্গে আপীল প্রভৃতির কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পণ্ডিত রাম-প্রসাদও সেখানে ছিলেন। কিন্তু ছোটরা রাজেন্দ্র লাহিড়ী আর রোশন সিং-এর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, আর যেন তা'দের মহত্ত্বের কিছু অংশ তার নিচ্ছিল। আমরা আমাদের গুরু সাজার কথা ভুলে খালি তাঁদের কথাই ভাবছিলাম। আমাদের মানসিক অবস্থা তখন এমন যে সম্ভব হলে তাঁদের শাস্তি নিজেরা গ্রহণ করতে পারলে খুশী হতাম।

সে সময়ে কি কি ঘটেছিল আমার সব তা মনে নেই। একটা খুব হৃদয়গ্রাহী কথা আমার মনে আছে। শাস্তি উচ্চারিত হবার পর আত্মীয় স্বজনদের প্রতি কেউ নজর দেয়নি। যদিও তাঁরা আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আকুপাকু করছিলেন। শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা সমর্থ হলেন। তাঁরা ফল আর মিষ্টি সঙ্গে করে এনেছিলেন। পুলিশ তাদের বড় কর্মচারিদের জিজ্ঞাসা না করেও এইসব জিনিষপত্র আমাদের দিল। কিন্তু কারুর তা' খাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। আমি শাস্তির খবর শুনে শুধু মানসিক ভাবে নয়, শারীরিক দিক দিয়েও যে কতটা আহত হয়েছিলাম সেটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে। আমাদের যে সব ফল দেওয়া হয়েছিল তার থেকে একটা আপেল আমি অন্যমনস্ক ভাবে

কামড়ালাম, কিন্তু সত্যিই বোধ হলো যেন একখণ্ড মাটী কামড়ালাম। অল্প সময়ের জন্য মুখ থেকে সমস্ত স্বাদ আমার সরে গিয়েছিল। আমি তখন আপেল ফেলে দিলাম, আর কিছু খাবার চেষ্টা করলাম না। কেউ যদি দু'ঘণ্টা আগে আমাকে বলতো যে তার মুখ থেকে স্বাদ চলে গেছে তবে তাকে আমি বোকা বলতাম। কিন্তু এখন কি পরিবর্তন। যারা শাস্তি শুনেছিল তাদের সবারই অবস্থা এমনি হয়েছিল। আমার চোখের দৃষ্টিও বোধ হয় আহত হয়েছিল, কেননা এ সময়ে আমি যা দেখছিলাম মনে হচ্ছিল যেন তা সবই অবাস্তব। মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবু আমি বাইরে বিমূঢ়ভাব দেখাইনি, আমরা এ সময়ে যা করেছিলাম তাতে সবাই আমাদের সাহসের প্রশংসাই করেছিল।

শেষ অবধি পুলিশ আমাদের সিনেমা হল থেকে বার করে নিতে সমর্থ হলো। আমি জানি না আমাদের শাস্তি বিধানের পর আর সেখানে সিনেমা হয়েছিল কিনা। আমার মনে হয় এর মঞ্চে যে নাটক আমরা অভিনয় করে গেলাম, এটা ছিল তুলনারহিত, কেউ এর গৌরবকে কখনও ম্লান করতে পারবে না।

আমরা ঘর থেকে বেরুবামাত্র কয়েকজন শ্বেতকায় সার্জেণ্ট আবির্ভূত হলো, তারা যে যে কমরেডদের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল তাঁদের নেবার জন্যে এসেছিল। একটা মোটর তৈরী ছিল, আর আমারা বুঝলাম যে অজানা গন্তব্যে কোথাও আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোঝা গেল পুলিশের কর্তৃপক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সব ব্যাপার ঠিক করেছিল আগেই, এখন সেগুলোকেই কাজে পরিণত করা হচ্ছে। যখন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টরা আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কমরেডদের নিয়ে যেতে এলো আমরা ভাবলাম যে তাঁদের ফাঁসী দিতে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুঝলাম যে তাদের নিরাপদ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র। যাই হোক আমরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালাম যেন "যেতে নাহি দিব"। বার বার সুবাদার আমাদের অনুরোধ করছিল তা'দের ছেড়ে দিতে। তখন কমরেডরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তাঁরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট মোটরে চড়লেন।

আমরা আমাদের বীর কমরেডদের গলায় মালা দিতে পারলাম না সত্য, কিন্তু আমাদের হৃদয়—আমাদের হৃদয় ছিল তাদের সঙ্গে। রাজেনবাবু তাঁর শিশুসুলভ হাসি হাসতে লাগলেন, রামপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে রইলেন, ঠাকুরসিং এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি স্বর্গে যাচ্ছেন আর আমরাই পড়ে রইলাম। তাঁর মুখে সহানুভূতিপূর্ণ অর্ধস্ফুট হাসি লেগেছিল।

গর্জন করে তাঁদের মোটর লক্ষ্ণৌ-এর সৌধশ্রেণীর মধ্যে হারিয়ে গেল। তখন আমাদের মনে হলো সব যেন শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে হলো পৃথিবীতে আমাদের যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই—অত্যন্ত অসহায় বোধ হতে লাগলো। আমাদের বীর কমরেডদের আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল, আমরা খালি অসহায় ভাবে চেয়ে রইলাম—করতে পারলাম না কিছুই। সমস্ত ঘটনার গতিস্রোত একমুহূর্তে যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। তবুও আমি যা' যা' করবার আর বলবার বললাম—করলামও। একটা অসহায় রাগে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে আরও মোটর এলো আমাদের নিয়ে যেতে। ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত কমরেডরা চলে যাওয়ায় এবার আমরা আমাদের কথা ভাববার অবসর পেলাম। এদিকে তাকিয়ে যেন আরও অন্ধকার বোধ হলো। কি যে ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আমরা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে এ সময়ে মুহুর্মুহু আমরা আর জনতা শ্লোগান দিচ্ছিলাম, পুলিশ তাই ঘটনাস্থল থেকে তখনই আমাদের সরাতে চেয়েছিল।

যাই হোক সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকে। আমরা তো সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দশবছর, চোদ্দবছর বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কাটাতে পারি না। কাজেই শেষ অবধি আমরা মোটরে চড়লাম। উত্তাল হয়ে উঠলো শ্লোগান আর জনতার উৎসাহবাণী। তারপর মোটর ছেড়ে দিল আর আমরা আমাদের গান আরম্ভ করলাম, "সব ফরোশী কি তমান্না"—ইত্যাদি। কিন্তু যখন সহরের শেষে পৌছলাম তখন আমাদের মধ্যের একজন বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, এবার কথাবার্তা বলা যাক্।" কাজেই গান ছেড়ে আমরা কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলাম। প্রথমেই আরম্ভ করলাম যে প্রধান বিচারালয় মৃত্যুদণ্ড রোধ করবে কি না। রোশন সিং-এর সম্বন্ধে সবাই স্থির ছিলেন যে তাঁর শাস্তি

রদ হবে। বাকী দুটো মৃত্যুদণ্ডের বিষয় কেউ জানতো না কি হবে। কাজেই আমরা ভাবলাম: যে করেই হোক্ মৃত্যুদণ্ড তাঁদের রোধ হবেই। তারপর আমরা নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে কথা বলাবলি করতে লাগলাম। আমাদের কি একত্রে রাখা হবে কিংবা পৃথক করে' ফেলা হবে? আমাদের প্রতি কি বিশেষ ব্যবহার করা হবে, না সরকার এখন থেকে প্রতিশোধ নিতে থাকবে?

জেলা জেলে পৌঁছে আমাকে অন্য একটা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হলো। চারটের সময় C. I. D. বিভাগের লোক এসে সকলের এমন কি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকদেরও ছবি তুলে নিয়ে গেল। যখন কমরেডদের condemned cell থেকে ছবি তোলবার জন্যে আনা হলো তখনই বুঝলাম যে তাঁরা এখনও এই জেলে আছেন। যাই হোক্ তাঁদের আবার দেখে আমরা বড় খুশী হলাম, ফটো তোলবার সময় আমরা অজানিতভাবেই প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কমরেডদের কাছে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লাম। এই ফটো এখনও C.I.D, বিভাগে রক্ষিত আছে—প্রকাশিত হয়নি। একজন বন্দীর তাঁর নিজের ফটোতেও অধিকার নেই, অধিকার আছে অন্যের। ফটো তোলা শেষ হলে আবার আমাদের পৃথক করে দেওয়া হলো। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কমরেডদের condemned cell-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আর আমরা ফিরে গেলাম গেটের কাছের ব্যারাকে। এই সময় এই চিরবিদায়ী কমরেডের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া খুবই করুণ হলো। আমরা স্পষ্টই বুঝলাম যে জীবনে এই দেখা আমাদের শেষ দেখা। কাজেই সবারই চোখে জল এলো। কেউ তাদের নিজের জন্যে কাঁদেনি। সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কমরেডদের জন্য এইভাবে কেঁদেছিল, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। যাবার সময় রাজেনবাবু আবার বললেন, "আমার কষ্ট তো অল্পস্থায়ী, কয়েক মাসের মধ্যেই তা' শেষ হয়ে যাবে, যারা চোদ্দবছর, বিশবছর জেলে কাটাবে তাদের কথাই আজ বার বার মনে করেছি।" এর চেয়ে সহানুভূতিপূর্ণ কথা জগতে আছে কি না জানি না। আমরা পরস্পরের সঙ্গে চিরজীবনের মতো বিদায় নিলাম পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে।

যাত্রাপথ যেন আর ফুরোয় না। আমি কিন্তু চাইছিলাম আরও দীর্ঘ হোক্ এই যাত্রাপথ। চোদ্দবছর কি ট্রেনে কাটানো সম্ভব নয়? এই যাত্রার পর ফিরে যেতে হবে কেন্দ্রীয় জেলের গর্ভে, কেউ জানে না কি ঘট্‌বে তারপরে। অবশ্য প্রথমেই জেলের নিয়মের বিরুদ্ধে আমি অনশন করবো ভেবে একটু উৎসাহ এলো। জানতাম যে এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কত শক্তিহীন। যুদ্ধে হেরে যাব জানি, কিন্তু এই বিরাট অসহায়তার পটভূমিকায় যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আমার ভালো বলে মনে হলো। যাত্রীরা যেই শুনলো যে আমরা কাকোরী বন্দী, তখনই তারা আমাদের তিনজনের জন্যে দুটো বেঞ্চ ছেড়ে দিল, আর খুব মনোযোগের সঙ্গে রোশন সিং-এর কথা শুনতে লাগলো। তাদের দিকে নজর দেবার মতো উৎসাহ আমার আর ছিল না, একটা বেঞ্চে আমি শুয়ে পড়লাম। দুবলীশজী আর ঠাকুর সাহেবের মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছিল কিছুক্ষণ আমি তাই শুনলাম। কিছুক্ষণের জন্যে মনটা চলে গেল অতীতে, কিছুক্ষণের জন্যে আবার অজানা ভবিষ্যতের জন্যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লাম। আমাদের কাজ যেখানে শেষ হলো, দেশ কি সেই কাজ তুলে নেবে না ভুলে যাবে? এখনও তো বহু প্রসিদ্ধ কমরেড্ বাইরে আছেন!…দরজার মধ্যে দিয়ে বহুদূরের অন্ধকারে আমি তাকিয়ে রইলাম। কিছুদূরে গাছের আভাষ দেখা গেল, তারপর সব অন্ধকার। ভাবনায় আর নানাকথার আবর্তে ক্লান্ত হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। আমার ঘুমোবার দরকার ছিল খুব, ঘুমিয়েও পড়লাম।

অকালে দুবলীশজী আমাকে "ওঠ ওঠ, ঠাকুর সাহেব চলে যাচ্ছেন", বলে ঠেলে ওঠালেন। আমি ধড়মড় করে উঠে বস্‌লাম। এলাহাবাদ জংশনে আমরা নেমে পড়লাম। এখান থেকে ঠাকুর সিংকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তাঁর পা স্পর্শ করলাম। আমি কখনও এ কাজ করতাম না, কিন্তু এবার আপনি থেকেই তাঁর পা স্পর্শ করলাম। তিনি তাঁর সঙ্গীসহ প্রস্থান করলেন। কিছুক্ষণ অবধি তাঁর পায়ের বেড়ীর শব্দ শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির মহিমা কীর্তন করতে লাগলো, আর, তাঁর 'ওম্' 'ওম্' ধ্বনি, তাঁর হৃদয়ের অনমনীয় দৃঢ়তা তার ওপর ভর দিয়ে জন্মের মত তিনি

চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের কাছে রইলেন শুধু স্মৃতি হয়ে।

ইতিমধ্যে প্রধান আদালতে আমাদের আপীলের শুনানী হলো। অপরাধীদের দিক থেকে আপীল ছাড়া সরকার ছ'জন ব্যক্তির—দুবলীশজী, সুরেশ ভট্টাচার্য, গোবিন্দচরণ কর, মুকুন্দ লালজী, যোগেশ চাটার্জী, আর আমার শাস্তি বাড়াবার জন্যে আপীল করলো। সরকার আমার চোদ্দবছর জেলে সন্তুষ্ট হয়নি। প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারক স্যার লুই স্টুয়ার্ট অন্য দু'জন বিচারকের সাহায্যে মামলাটি চালনা করলেন। বাড়তি আর প্রধান দুটো মামলার আপীলের শুনানীও একসঙ্গে হলো। বাড়তি মামলার আসামী আসফাকের মৃত্যুদণ্ড হলো, বক্সীর হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। প্রধান বিচারালয় চারটে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্থির করলো, আর দুবলীশজী, সুরেশ ভট্টচার্যের শাস্তি সাত থেকে দশ বছর করে দিল। আর গোবিন্দ কর, মুকুন্দীলাল আর যোগেশ চাটার্জীর হলো দশ বছর থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আমার ব্যাপারেও তারা শাস্তি বাড়াত, কিন্তু আমার অল্পবয়সের জন্যে আর সেটা ঘটলো না। পুলিশ রামকৃষ্ণ ছত্রীর বিরুদ্ধে আপীল করেনি। কিন্তু প্রধান বিচারক অযাচিতভাবে বললেন যে যদি পুলিশ তার বিরুদ্ধে আপীল করতো তবে তার শাস্তিকাল তিনি নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিতেন। এই মন্তব্যেই বোঝা যাবে কি মনোভাব নিয়ে আপীলের রায় দেওয়া হয়েছিল। প্রিভী কাউন্সিলেও আপীল করা হলো কিন্তু ফল কিছু হয়নি। কম্‌রেডদের ফাঁসীর দিন ঠিক হলো অক্টোবরের কোনো দিন। কিন্তু কেন যে ফাঁসী তখনকার মতো বন্ধ করা হলো জানিনা। তারপর আর একটা তারিখ ঠিক হলো, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। দুটো তারিখ পেছিয়ে গেলে আমাদের আবার আশা জাগলো। আমরা ভাবলাম যে বোধ হয় কম্‌রেডরা এ যাত্রায় বেঁচে গেল। কিন্তু না, সরকার তাঁদের ফাঁসী দেবার জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সতেরই ডিসেম্বর রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর ফাঁসী হয়ে গেল গোন্দা জেলে, ১৯২৭-এর ১৯শে ডিসেম্বর বিশমীল-এর ফাঁসী হলো গোরখপুরে, আসফাকের হলো ফৈজাবাদে আর রোশন সিংএর হলো এলাহাবাদ জেলে। এইটুকুই বলতে পারি যে এই সব ফাঁসী

আমাকে কঠিন আঘাত দিল, সেইদিন থেকেই আমি নিজেকে সর্বতোভাবে নাস্তিক বলে সর্বসমক্ষে পরিচয় দিতে চাইলাম।

এই সব ফাঁসীতে দেশে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এই সব ফাঁসীর পর সে বছরের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হলো। "কাকোরী মামলায় সরকারের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সম্বন্ধে একটা বিশেষ প্রস্তাব পাশ হলো, কেননা, প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে সরকার নত হয়ে তাদের পরিবারকে অন্তরের সঙ্গে সহানুভূতি জানাচ্ছে।" প্রস্তাবের ভাষা থেকেই লোকে বুঝবে যে সে সময়ে জনমত কি রকম প্রবল হয়ে উঠেছিল। এতে বিপ্লবীরা হতাশ না হয়ে আরও দৃঢ় হলো। তারা নোতুন নোতুন কাজে মেতে উঠলো। পরে ১৯২৮ সালের ৭ই জানুয়ারী আমার পৃথক কারাবাস শেষ হলো, ভাবলাম দু'চার দিনের মধ্যেই আমাকে সুদূর বেরিলী জেলে পাঠান হবে।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল সেটা তো ছিলোই, আর এখন আর একটা জাতীয় আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সাইমন কমিশনের আগমন। এই কমিশন ইংরেজী পার্লামেণ্ট কর্তৃক এর আগে যে কয়েকটা সংস্কারবিধি পাঠান হয়েছিল তার সাফল্যের আশা কতটা তাই দেখতে এসেছিলেন। এবং এই সঙ্গে আরও 'সংস্কার' করতে এসেছিলেন। এই কমিশনের সাতজন সভ্যই ছিলেন ইংরেজ। এতে ভারতের জাতিয়তাবাদিরা রেগে গেলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁরা বোম্বেতে নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতা কালো ফ্ল্যাগ দেখিয়ে চেঁচাতে লাগলো "সাইমন, ফিরে যাও"। এঁদের ভারতে আগমনের দিনটা সর্বভারতীয় হরতাল দিবস পালিত হলো। মাদ্রাজে পুলিশ বিক্ষোভকারিদের ওপর গুলি চালালো। বিপ্লবীদল তার নিজের উপায়ে কমিশনকে অভ্যর্থনা জানালো। কাশীর মার্কণ্ড সিংএর নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক কমিশনের ওপর বোমা ছুঁড়লো। যুক্তপ্রদেশ খুবই উত্তপ্ত বোধ হওয়ায় তারা বোম্বে প্রেসিডেন্সীর কোথাও তাদের প্ল্যানটিকে কার্যকরী করবার মনস্থ করলো, কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাদের প্ল্যানটি কার্যকরী হলো না। বিপ্লবীরা যখন বোম্বেতে বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মনমদ্ স্টেশনের কাছে সেটা ফেটে গেল। মার্কণ্ড নিজে মারা গেল এবং তিনজন

যাত্রীও মারা গেল। মার্কণ্ডের সহকর্মী হরেন্দ্র ভট্টাচার্য খুব বেশী আঘাত পেলো। সে অজ্ঞান অবস্থায় ধরাও পড়লো। সে সব বলে ফেললো আর তার বন্ধু মনোমোহন গুপ্ত কাশীতে যিনি নিরাপদে ছিলেন তাঁকেও পুলিশে ধরলো। শেষে হরেন্দ্রনাথ জবানবন্দী প্রত্যাহার করে নিল, তাই মনোমোহনের সঙ্গে তারও সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। এদের উদ্দেশ্য অসফল হলেও তারা দেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। আর এতেই বোঝা গেল যে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই কমিশনকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন।

লাহোরে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ খুব প্রবল হল। এখানে বিক্ষোভের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন প্রসিদ্ধ নেতা লালা লাজপৎ রায়। "যখন তিনি হাজার হাজার বিক্ষোভকারিদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন একজন অল্প বয়স্ক পুলিশ অফিসার তাঁকে অপমান ও প্রহার করলো"। এই আঘাতের ফল ভয়ানক হলো এবং শীঘ্রই লালাজী মারা গেলেন। এরকম একজন শ্রদ্ধেয় নেতাকে এরকমভাবে মারায় দেশবাসী ভয়ানক আঘাত পেল। ডাক্তারের মতে ঐ আঘাতের ফলেই এই মৃত্যু হলো। এই খবরে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্য অসহায় ঘৃণায় যেন বিদীর্ণ হতে চাইলো। এই সময়ে ভগৎ সিং আর আজাদের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন পার্টির আবির্ভাব ঘটলো। এই পার্টি পরে বিপ্লবীদের ইতিহাস গড়ে যায়। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, জয়গোপাল যে ইংরেজ কর্মচারী মিঃ সানডারস্ লালাজীকে হত্যা করেছিল, তাকে হত্যা করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো। যখন ঐ কর্মচারিটি তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তাকে গুলি করা হল, আর সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। আবার একবার বিপ্লবীদল জনতার জাগ্রত মতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলো। কাজেই জনসাধারণ যে তাদের বীর বলে গ্রহণ করবে তা'তে আর আশ্চর্যের কি আছে ?

বেরিলীতে ভগৎ সিং, যতীন দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের খবর আমাদের কাছে পৌঁছলো। এরপরে দেখা যাবে যে তাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলার আগে ১৯২৮ সালের

জানুয়ারীতে যে বেরিলী কেন্দ্রীয় জেলে আমি গিয়েছিলাম তার বিষয়ে দু'চারটে কথা বলা উচিত।

কাকোরী বন্দীদের মধ্যে রাজকুমার সিংহ ও মুকুন্দীলালজীকে 'বেরিলী কেন্দ্রীয় জেলে পাঠান হয়েছিল। আমাদের বিচারাধীন অবস্থার শেষের দিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা সেখানে অনশন করেছিল। বহু কষ্টের মধ্যে তাদের অনশন চালাতে হয়। সুপার কর্ণেল হল্‌রয়েড, জোর করে খাওয়া বিশ্বাস করতো না। তাঁর যুক্তি এই ছিল যে যারা দেহ বা মনের কোনো ব্যাধির জন্যে খেতে পারেন না তাদেরই জোর করে খাওয়ানো উচিত। অনশনকারিরা ইচ্ছে করে খায় না। কাজেই তাদের এই উপায়ে সাহায্য করা উচিত নয়। ফল হয়েছিল এই যে, বেরিলী জেলের কমরেড্‌দের অবস্থা শীঘ্রই খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দীলাল বত্রিশ দিনের দিন অনশন ত্যাগ করেন। রাজকুমার আটত্রিশ দিন অনশনের পর অনশন ত্যাগ করেন। আমার মনে হয়, যতীন দাসের পর কেউ আজও এই রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। রাজুর অবস্থা অনশনের পর খুব খারাপ দাঁড়িয়েছিল। কেননা অনশনের সময় তার পেটের কাজ একেবারেই হয় নি। তাই অনশনের পর প্রথম তিনি যখন খাদ্য গ্রহণ করলেন তখন তার খুবই অপকার হয়েছিল। বহুদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তাঁর জীবনের আশঙ্কার কারণও হয়ে উঠেছিল।

আমি যখন বেরিলীতে পৌঁছলাম তখন তিনি ভালো হয়ে গেছেন। ভালো হতেই তাঁকে শস্য পেষবার কাজ দেওয়া হলো! সমস্ত কাজটাই না করতে চাওয়া তিনি উচিত মনে করলেন না। কাজেই তিনি পূরো কাজই করতে লাগলেন। যখন কর্নেল হল্‌রয়েড্ আমাকে সুস্থ দেখলেন তখন তিনি আমাকেও ঐ কাজে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু Mr Teyne প্রধান জেলার, খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আমাকে একাজ থেকে বাঁচিয়ে ban-এ দিলেন। রাজকুমারকেও শীঘ্রই ঐ কাজে নিযুক্ত করা হলো।…আমরা কখনও পূরো কাজ করতাম না। জোর করে সাধ্যমতো কাজ করান হলেও আমরা তা' করতাম না। এইভাবে আমরা সমস্ত কাজ প্রত্যাখানও করতাম না, আবার পূরো কাজও করতান না। জেলের কর্তৃপক্ষ কাকোরী বন্দীদের এই

প্রতীকপূর্ণ কাজে অভ্যস্থ হয়ে পড়লেন। কেবল শচীন বক্সী বাদ কাকোরী বন্দীদের বেশীর ভাগই ঐ রকম প্রতীকপূর্ণ কাজ করতেন। অবশ্য প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রতীকপূর্ণ কাজ আমরা করতাম না। আমি নৈনী জেলে বহু ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে পুরো কাজ করার চেয়ে কম কাজ করে শাস্তি পাওয়া ভালো। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখলাম যে কর্তৃপক্ষ কিছুদিন পর আমাদের এই প্রতীকপূর্ণ কাজ কিংবা একেবারে কাজ না করার ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। আমাদের কাজ করবার জন্যে তাঁরা জোরও করতেন না।

এইভাবে কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে আমরা পড়বার বহু সময় পেলাম। সাধারণ বন্দী হিসাবে আমাদের কোনো কাগজ দেওয়া হতো না। কিন্তু মিঃ দামোদরস্বরূপ শেঠ আমাদের একটা করে সাপ্তাহিক "প্রতাপ" নিয়মিত ভাবে পাঠাতেন। তা' ছাড়া তাঁর কাগজ মাঝে মাঝে আমরা বেআইনী ভাবে লিখতাম। আমাদের বেরিলা জেলের জীবনে শ্রীমতী সুশীলা ঘোষ, রাজুর বোন আমাদের বহু বিষয়ে বহু সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাদের প্রায় প্রত্যহই কাটিং আকারে সমস্ত প্রধান প্রধান খবর পাঠাতেন এবং আমাদের টাকাও যোগাতেন। এই টাকাটা বেআইনীভাবে খবর চলাচলের পক্ষে অপরিহার্য। তিনি আমাদের আহার্য দ্রব্যও পাঠাতেন। এইভাবে যেখানে যেখানে সম্ভব আমরা জেলের আইন ভঙ্গ করতাম। অবশ্য সর্বদাই ধরা পড়ে কঠিন শাস্তির সম্ভাবনা থাকতো, কিন্তু আমরা সর্বদাই এই বিপদের ঝক্কি নিতাম। প্রত্যহ কাগজ ভিন্ন জীবন দুর্বিসহ হতো। কাজেই এই ঝুঁকি আমাদের নিতেই হতো। আমাদের জেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে এই বেআইনীভাবে খবর আদানপ্রদান খুবই কার্যকরী হয়েছিল। প্রত্যেকটি খবর শেঠজীর কাছে পাঠানো হতো, আর পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে সেটা বেরিয়ে যেত। সে সময় জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো বিপ্লবীদের জাতীয় আন্দোলনের একটা অংশ বলে বিবেচিত হতো। ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন যেমন শ্রেণী সচেতন হয়েছে আগে তা ছিল না। কাজেই সমস্ত খবর তারা ছাপতো। এমন কি "লিডার" পত্রিকাও আমাদের সব খবর ছাপাতো।

তবুও বেরিলীর জীবন নিরুদ্বেগ ছিল না। আমার মতের বিরুদ্ধে রাতে আমাকে ব্যারাক বদলাতে হতো। প্রত্যেক রাতে আমাদের বিভিন্ন ব্যারাকে শুতে হতো। এটা বড় কষ্টকর ছিল আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্থায়ী-জীবনের স্বাদ এর জন্যে আমরা পাইনি।

বেরিলীতে পৌঁছেই আমি জানলাম যে এখানে দু'জন বাঙালী রাজবন্দী আছেন। তাঁদের একজনের নাম প্রতুল ভট্টাচার্য ও অপর জনের নাম গণেশ ঘোষ। তাঁরা রাজবন্দী বলে তাঁদের একটা আলাদা বিভাগে রাখা হতো ; তবুও তাঁরা আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা প্রচুর বই পেতেন, আমরা তিকড়মের সাহায্যে ঐ বই নিতাম। প্রতুলবাবুর গোরিলা যুদ্ধ, যুদ্ধের অবস্থান, আর সামরিক বিদ্যা সম্বন্ধে বহু বই ছিল। আমরা এই বইও পড়তাম। তাঁরা প্রায়ই আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে মাখন আর অন্যান্য খাবার জিনিষ পাঠাতেন। রবিবারে কর্ণেল হল্‌রয়েড্ জেলে আসতেন না, এলেও কেবল মাত্র দশ মিনিটের জন্য হাসপাতাল দেখতেন। জেলের নিম্নতম কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্যে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা দশটার সময় রাজবন্দীদের ব্যারাকে গিয়ে, পাঁচটায় ফিরতাম। এই কমরেড্‌দের আতিথেয়তা আমি কখনও ভুলবো না।

তাঁরা কখনও আমরা দিনে তিনআনা আর তাঁরা তিনটাকা করে পেতেন বলে আমাদের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁরা খুব শীঘ্রই তাঁদের মুক্তির আশা করছিলেন, সে জন্যে তাঁরা বাংলায় প্রকাশের জন্যে আমাদের কাকোরী মামলার একটা বিবরণ লিখে দিতে বলেছিলেন। কেননা, বাংলার লোকেরা আমাদের সম্পর্কে খুবই কম জানতো। সেইমতো আমরা কাকোরী মামলার একটা পূর্ণ বিবরণ লিখে দিলাম, বিশেষ করে শহীদদের বিষয়। ছাড়া পাবার পর তাঁরা Search lightএর সহ-সম্পাদক মিঃ মণীন্দ্রনারায়ণ রায়কে এটা ছাপতে বলেছিলেন। মিঃ রায় এই সব উপাদান দিয়ে কাকোরী ষড়যন্ত্র বলে একটা চমৎকার বই বার করেন। এই বই সরকার বাজেয়াপ্ত করে আর মিঃ দাসের আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অবশ্য এই বইটাই কাকোরী শহীদদের বিষয় একমাত্র বই নয়। ফাঁসীর পর কানপুরের প্রতাপ প্রেস কাকোরী শহীদদের

ওপর একটা বই লেখবার প্রস্তাব করেছিলেন। তারা এ সম্বন্ধে আমাদের খবর জানায়। কিন্তু তারা বলে তারা এসব অজানা যুবক, যারা রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিষয় কিছুই জানে না। কাজেই আমরা তাদের জন্যে বে-আইনীভাবে ভালো ভালো সব রসদ পাঠিয়ে দিলাম। এইভাবে "কাকোরী কি শহীদ" বইটি বার হয়। বইটি প্রচুর বিক্রি হয়, আর অল্পদিনেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণটি যখন ছাপাখানায় তখন সরকার এটাকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

এই সময় ঐতিহাসিক লাহোর অনশন আরম্ভ হলো। যতদূর স্মরণ হয় এটি বোধহয় ১৯২৯ এর আগস্ট মাস। তবে দিল্লীতে থাকবার সময়েই ভগৎ সিং বোধ হয় মে মাসে অনশন আরম্ভ করেন। লাহোর বন্দীরা বোধ হয় ২২শে জুন অনশন আরম্ভ করেন। আমাদের অনশন ছিল স্থানীয়। আমরা লাহোর-কমরেড্‌দের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলাম কিন্তু শীঘ্র জয়লাভ করায় আমরা কি ঘটে দেখতে লাগলাম। মোটের ওপর আমাদের সকলের লড়াই-ই এক। পরে সর্দার গণেশজীকে বলেছিলেন যে কাকোরী বন্দীদের মতো স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁরা কিছু গ্রহণ করবেন না। আমরা প্রতিদিনই অনশনের খবর পাচ্ছিলাম। প্রথমে শুনলাম যে বটুকেশ্বর দত্তের অবস্থা ক্রমশই উদ্বেগজনক হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ শুনলাম যে যতীন দাসের অবস্থা খুবই খারাপ। সরকার যে কোন ব্যক্তির জামীনেই তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল, কিন্তু কারুর জামীনে ছাড়া পেতে যতীন্দ্র রাজী হলেন না। ৭ই সেপ্টেম্বর যতীনের অবস্থা খুবই খারাপ হতে হতে সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে মৃত্যু তাঁর শরীরকে গ্রাস করছিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি বিচলিত হননি। ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা গেলেন। দেশ দুঃখে আকুল হয়ে উঠলো। সত্যকথা বলতে কি কোনো মৃত্যু এমন কি সর্দারের মৃত্যুতেও দেশে এত সাড়া জাগেনি। সর্বত্র একটা অবিমিশ্রিত দুঃখ দেখা গেল। তার মৃতদেহ লাহোর থেকে কোলকাতায় বিশেষ ট্রেনে করে আনা হলো। কোলকাতার নাগরিকদের প্রতিভূ হয়ে সুভাষচন্দ্র এর খবরটা বহন করলেন।

যতীন দাস স্বেচ্ছায় শহীদত্ব বরণ করলেন। মুক্তি চাইলেই তিনি মুক্তি পেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক-বন্দীদের জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর এই আত্মত্যাগের জন্যেই বিশেষ করে আজ জেলে এই বিভাগ হয়েছে। যদিও এই বিভাগ খুব সন্তোষজনক নয়, কেননা এতে রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ কিছু ভাবে নির্দেশ করা হয় নি। যাই হোক, এতে জাতি বিভাগ উঠে যায়, এটাও কিছু কম নয়। যতীনের দেহ ছিল মেয়েদের মতো ক্ষীণ, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল আনন্দপূর্ণ, তিনি নিজে হাসতেন, অন্যকেও হাসাতেন। একবার তিনি কাশীতে এসে রাজেন লাহিড়ীর সঙ্গে থাকায় তাঁর সঙ্গে আমি মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিন কে ভেবেছিল যে এই ক্ষীণকায় অজানা যুবক একদিন জাতীয়জীবনে একটি অবিনশ্বর উজ্জ্বল ইতিহাস গড়ে যাবে? যতীন দাসের নাম চিরদিন লোকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তিনি শুধু রাজনৈতিক যোদ্ধা বা শহীদ বলেই নন, নিজেকে উৎসর্গ করবার শক্তি-প্রতিভায় তিনি বুদ্ধ বা খৃষ্টের সমতুল্য বলেই মনে করি।

যতীনের মৃত্যুখবরে আমাদের ওপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আমরা তৎক্ষণাৎ অনশন আরম্ভ করলাম। এ সময়ে স্থানীয় কোনো অভিযোগের সঙ্গে এ অনশনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা ছিল একেবারেই রাজনৈতিক অনশন। যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কোনই ঝগড়া ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁরা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমাদের ঝগড়া যেন তাদেরই সঙ্গে। বর্মার স্বাধীনতা সৈনিকদের সেলে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো, কিন্তু আমরা দমলাম না। এবারের অনশনের এই বিশেষত্ব ছিল যে এতে প্রায় তিনশ' বন্দী যোগ দিয়েছিল। যতীন দাসের শহীদত্বের খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। মেজর ভাণ্ডারী যদিও সুপার ভালোই ছিলেন কিন্তু তিনি যখন তখন বন্দীদের মারধোর করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর উপস্থিতিতেই এত মারা হতো যে আসামীর কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তো। সাধারণ বন্দীরা অনশনে যোগ দেওয়ায় তিনিও খুব ভয় পেয়ে গেলেন।

তিনি তাঁদের সবাইকে জেলে তালা দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাদের এক এক করে বার করে এনে যতক্ষণ না অবধি তারা খেতে রাজী হয় ততক্ষণ অবধি তাদের মারার হুকুম দিলেন। কেউ কেউ তাঁর হুকুম মানলো না। কিন্তু তারা তৃতীয়দিনের দিন অনশন ত্যাগ করলো। আমাদের অনশন সেপ্টেম্বর অবধি চললো। কয়েকজন স্থানীয় এম, এল, সী এসে আমাদের বললেন যে লাহোরের কমরেড্‌রা অনশন ত্যাগ করেছেন, অতএব আমাদেরও অনশন ত্যাগ করা উচিত। এই অনশন ছিল তীব্রঘৃণাসম্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। আমরা আগস্ট-অনশন থেকে তখনও ভালো করে সারিনি। কাজেই ওই অনশনে আমাদের শরীরের খুবই ক্ষতিই হল।

লাহোরের অনশন শেষ হ'ল। দেশের লোক এবার রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। সরকার শীঘ্রই একটা মিট্‌মাটের আশা দিল। কিন্তু লোকের কথায় তারা কাজ করছে না, একথা দেখাবার জন্যে তারা একটা প্রাদেশিক জেল পরিদর্শন কমিশন নিযুক্ত করলো। কিন্তু কিছুই ঘট্‌লো না। সরকার প্রশ্নটাকে যেন চাপা দিতে চাইলো। তাই ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীতে লাহোর বন্দীরা আবার অনশন আরম্ভ করলো। এ সময় আমরা মনস্থির করে ফেলে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমরা ঠিক করলাম যে এবার লাহোর বন্দীরা অনশন ত্যাগ করলেও আমরা ত্যাগ করবো না। আমাদের চারজনই অনশনে যোগ দিলাম। অনশনে যোগ দেবার সময় লিখে জানালাম আমাদের দাবী কি কি। এগুলো ছিল, আমাদের বিচারাধীন সময়ের আর নৈনীজেলের দাবীরই পুনরাবৃত্তি। এবার অনশন আরম্ভ করা মাত্রই মেজর ভাণ্ডারী আমাদের সেলে পাঠিয়ে দিলেন।

এই সময়ে ১৬ই জানুয়ারী আমার বাবা মারা গেলেন। বাবু শ্রীপ্রকাশ খবরটা পাঠিয়ে সুপারকে জানিয়েছিলেন যাতে খবরটা ভালোভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রে ভদ্রতা বলে' কোনো কথা নেই! আমাকে যখন সেলে রাতের জন্যে তালা দেওয়া হচ্ছিল তখনই আমাকে চিঠিটা দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, অনশন আরম্ভ হ'ল ৭ই ফেব্রুয়ারী আমার দ্বাবিংশতম

জন্মদিনে। আমার মন তখনও শোকে আচ্ছন্ন। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনশন আরম্ভ করলাম। আমাদের দাবী ছিল, জেলের সমস্ত আইনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরোধের আহ্বান। কাজেই আমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংগ্রামে প্রস্তুত হলাম। আমরা জানতাম যে আর একজন যতীন-দাসের-ও হয়তো প্রয়োজন হবে।

ইতিমধ্যে সরকার অনশনকারিদের সঙ্গে ব্যবহারের জন্যে কয়েকটী চমৎকার উপদেশ পাঠালেন। কোন সূত্রে সরকার খবর পায় যে, জোর করে খাওয়ানয় অনশনকারীদের উপকার হয় আর অনশন দীর্ঘদিন চালাতে সমর্থ হয়। তাছাড়া অনশনকারিদের নিজে খেতে ইচ্ছে হলেও জোর করে খাওয়ানোয় সেটা বন্ধ হয়। সরকার খবর পেয়েছিল যে কোন কোন প্রসিদ্ধ অনশনে অনশনকারিরা সরকার কর্তৃক জোর করে খাওযানোয় আর অন্যদিকে লুকিয়ে কিছু পানীয় আনানোয় আন্দোলনে জয়লাভ কোরতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক নতুন নিয়মে বলা হল যে, কেবল মাত্র বাঁচিযে রাখবার জন্যে তাদের জোর করে খাওয়ান হবে। আমরা এই উপদেশের কথা জানতাম না। মেজর ভাণ্ডারীর শীঘ্রই ছুটী নেবার কথা ছিল। আমাদের অনশনে সেটা বন্ধ হওয়ায় সে আমাদের উপর খুব রেগে গেল। কেবলমাত্র প্রেসের ভয়েই সে আমাদের মারধোর করেনি। সে চিরদিন জেলের সবাইকে তার পদানত করেছে! কেবলমাত্র আমাদের বেলাতেই তার পরাজয় ঘটল।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। প্রথম থেকেই এই অনশনের খবর প্রচুর ভাবে প্রচারিত হয়। দেউলী অনশনকারিরা ছাড়া আর কেউই এত প্রচারের সুবিধা পাননি। যে অনশনে যতীনদাস যোগ দিয়েছিলেন, সেই অনশনের মত এতেও বহু বন্দী যোগ দেয়। প্রথম থেকেই সরকার খুব বিচলিত ভাব দেখাচ্ছিল। তারা বুঝেছিল যে সর্দার আর তার বন্ধুরা মৃত্যু পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যেতে প্রস্তুত আছেন। সরকার আর একজন যতীন দাসের আবির্ভাব হতে দিতে রাজী ছিলেন না। কাজেই ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার একটা সংবাদ বার করলেন। এই সংবাদটি ছিল অনশনের ফল। কিন্তু সরকার সেকথা স্বীকার না করে বলেছিলেন—"ভারত সরকার কযেকবছর থেকেই বর্তমান জেলগুলির নিয়মের কিছু কিছু বদল করবার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। স্থানীয়

কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে জানান হয়েছিল। তাঁরা বহু পরামর্শ করে তাঁদের সিদ্ধান্তে এসেছেন। এইজন্য প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক আহূত হয়েছিল এবং ভারত সরকার ও আইনসভার কয়েকজন নামকরা সভ্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য সমস্যাগুলি জটিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। যদিও ভারত সরকার এইসব সিদ্ধান্ত একেবারে গ্রহণ করেন নি, তবুও তাঁরা এগুলির প্রতি যোগ্য গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সবচেয়ে প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তারা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সেটাই ঘোষিত হলো।"

কেউ এটা পড়লে স্বভাবতই মনে হবে যে ভারত সরকার স্বেচ্ছায় এগুলি করেছেন, যতীন দাস বা তাঁর পরবর্তী লাহোর ও কাকোরী বন্দীদের অনশনের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার বন্দীদের তিনটি ভাগে ভাগ করলেন। এ, বি ও সি শ্রেণী। জাতি বিভেদ বন্দীদের মাঝ থেকে দূর হলো। জেলের নিয়মে এটা যে একটা বিরাট বিপ্লব তা মানতেই হবে। কিন্তু কাকোরী বন্দীরা, যতীন দাস আর লাহোর বন্দীরা প্রথমেই যে দাবীগুলির জন্যে লড়েছিল এতে সেগুলি পূর্ণ হলো না। তবুও বর্তমানের জন্যে এই আইনটা যথেষ্ট ছিল। কাজেই ১৯শে ফেব্রুয়ারী সর্দার আর লাহোর বন্দীরা অনশন ত্যাগ করলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী সুপার সরকারের সিদ্ধান্তে আর লাহোর বন্দীদের অনশন ত্যাগের খবর আমাদের দিল। এ সময়ে আমাদের অনশনের চতুর্দশ দিবস চলছিল। আমাদের চারজনকে স্ট্রেচারে করে বাইরে গিয়ে পরামর্শ করবার সুযোগ দেওয়া হলো। এ সময়ে আমরা শেষ অবধি লড়তে প্রস্তুত ছিলাম। তাই ঠিক হলো সরকারের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়। প্রাদেশিক সরকাররা এই সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন কিনা তার স্থিরতা কি? তাছাড়া যদি তারা এ সিদ্ধান্ত মেনেই চলে, তবুও আমাদের প্রতিও যে এই সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হবে তারই বা স্থিরতা কি? কাজেই আমরা ঠিক করলাম যে যতক্ষণ অবধি না সরকার আরও কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ততক্ষণ অবধি আমরা অনশন চালিয়ে যাব। সর্দার আর লাহোর বন্দীদের মামলা আলাদা ছিল! বিচারাধীন বন্দী

হিসাবে তাঁরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বিশেষ ব্যবহার পাচ্ছিলেন। তাঁরা তাই কিছুদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপার ছিল একেবারে আলাদা। আর একদিনও আমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল না। তাছাড়া আমাদের গভীর সন্দেহ ছিল যে ঐ বিভাগে আমাদের ফেলা হবে কি না। কেননা, আমাদের প্রকৃতিগত অপরাধীদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। আমরা পেশাদার অপরাধী, কাজেই বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য নেই—সরকার সহজেই একথা বলতে পারে। আমাদের এই সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয় সেটা বোঝা গেল যখন লাহোর বন্দীদেরও উচ্চশ্রেণীর অন্তভূক্ত করা হলো না। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সরকারই তাঁদের বি-শ্রেণীভুক্ত করেছিল, নয়তো এর আগে এরা সি-শ্রেণীভুক্তই ছিলেন।

বেরিলী জেলের কর্তৃপক্ষরা স্থির জানতেন যে লাহোর জেলের বন্দীরা যখন অনশন ত্যাগ করেছেন তখন আমরাও অনশন ত্যাগ করবো। কাজেই আমরা যখন অনশন ত্যাগ করতে রাজী হলাম না—তখন তারা খুবই হতাশ হলো। তারা রেগেও গেল। মুকুন্দলালজী অনশন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা রাজী হইনি। কাজেই অনশন চলতে লাগলো। আর আমরা নিজের নিজের সেলে ফিরে গেলাম। জেলের বাইরে আমাদের বন্ধুরা বিশেষ করে শেঠজী আমাদের অনশন চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করলেন না। কিন্তু এ'সব সত্ত্বেও আমরা আরও দৃঢ় হলাম এবং অনশন চলতে লাগলো।

চল্লিশ দিনের দিন আবার আমাকে জোর করে' খাওয়ান হলো। মানে তখন অবধি চার পাউণ্ড দুধ মাত্র আমার পেটে গেছে। তার মানে পুরো অনশন। মেজর ভাণ্ডারীকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটাই পালন করেছিলেন। এ সময়ে আমরা দুর্বলতায় অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিলাম। নাড়ার গতি পৌঁছেছিল ছত্রিশ-এ। আমিই ছিলাম দলের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। অনশনের সময় আমার দু'বন্ধুর চেয়ে আমি ভালো ঘুমোতাম। অবশ্য এটা ঘুম না আচ্ছন্নভাব তা' জানি না। যাই হোক এইভাবে রাতটা আর দিনের বেশীর ভাগ সময় আমার কেটে যেত। শিশুকাল থেকেই আমি ভোরে উঠি। কিন্তু এখন মনে হতো যত দেরীতে উঠি ততই ভালো। আমি

ভোরে উঠেও চোখ বন্ধ করে থাকতাম। যতক্ষণ সম্ভব আমি ঐভাবে থাকতাম।...অনশনে অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত দেখাতে হয়। যদি কোনো উপায়ে সময় কাটান যায় তবে বিজয় অবধারিত। অবশ্য হঠাৎ যদি মারা যাবার উপায় থাকে তবে অনশনকারীরা তাকেই চাইবে!

একজন বন্দী আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। সে ছিল একজন পূর্ণবয়স্ক জাঠ। এক এক করে আমাদের সেল খোলা হতো। আমার সময় হলে লোকটি দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়ে আমাকে বসিয়ে দিত, আর আমি মুখটুখ ধুয়ে নিতাম। ইতিমধ্যে সেলটা পরিষ্কার করা হতো। মুখ ধুয়ে আমি আবার শুয়ে পড়তাম। এই সময়ে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে দেহের সর্বত্র একটা ব্যথা অনুভব করতাম। আমার জাঠ পরিদর্শক ডাক্তারের কাছ থেকে এক রকম তেল এনে সমস্ত শরীরে মালিশ করে দিত। এতে সাময়িকভাবে আরাম হতো। একদিন আমি ভাণ্ডারীকে এই ব্যথার কথা বললাম। সে বললে ওষুধ খেলেই এই ব্যথা দূর হবে। বলা বাহুল্য, এ সময়ে আমরা সবরকম ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করেছিলাম। তিনি নাটকীয়ভাবে বলতেন যে যারা নরমাংস খায় আমরা তাদেরই ঐতিহ্য বহন করছি! কেননা আমরাও তো আমাদের শরীরে সঞ্চিত মেদ আর মাংস আহার করছি। বহু তেল মালিশ করে বুঝলাম যে না খাওয়ার জন্যেই এই ব্যথা, না খেলে এটা কমবেও না। তবুও ডাক্তার যখন মালিশের জন্যে তেল পাঠাতেন তখন আমরা খুশিই হতাম। কেননা এতে খানিকটা সময় কাটতো। তা' ছাড়া স্থায়ী শান্তি যখন পাওয়াই যাবে না, তখন অল্পস্থায়ী শান্তিকেও হেয় করা উচিত হবে না।

এ সময়ে আমরা এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে প্রত্যহ স্ট্রাইক সম্বন্ধে আমরা কাটিংগুলো পেতাম। একটা ওয়ার্ডার নিয়মিতভাবে শেঠ দামোদর স্বরূপের বাড়ী যেতো! এই ওয়ার্ডারকে শ্রীমতী সুশীলা ঘোষ প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন। এ'ছাড়া একজন কর্মচারীরও কতকটা দয়াপরবশ হয়ে কতকটা টাকার লোভে আমাদের খবর এনে দিত। এই কাটিংগুলো এলে আমরা কিছু সময়ের জন্যে খুশি হয়ে উঠতাম। শেঠজী বুঝেছিলেন যে আমাদের পথ থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তিনিও আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। কাজেই

তিনিও আমাদের অনশন চালিয়ে যেতে বলতেন। রোজ প্রচুর টেলিগ্রাম আসতো। দুঃখের বিষয় সেগুলি পড়বার পরই আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হতো। কাজেই আমরা তা' আর পেতাম না।

চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে পর কর্তৃপক্ষ দেখলেন আমাদের জোর করা বৃথা। যদিও সংখ্যার দিক দেখতে গেলে চল্লিশ দিন কিছুই নয়। কেননা শেষের বার ভগৎ সিং ১৪৪ দিন অনশন করেছিলেন। কিন্তু যে পরিমান ওজন আমাদের কমে গেছে এবং স্বাস্থ্য যে পরিমাণে খারাপ হয়েছে তা'তে কর্তৃপক্ষ আমাদের জীবন নিয়ে খেলা করতে সাহস করলেন না। দৈনিকভাবে তাঁরা আমাদের টিউব দিয়ে খাওয়াতে আরম্ভ করলেন।

অনশনের পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন আমি কয়েকজন সাক্ষাৎকারীকে বললাম যে এখন আর আমাদের অনশন থেকে নিবৃত্ত না করে বরঞ্চ আমাদের মৃতদেহ সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করাই ভালো। কেননা এখন প্রশ্ন হলো দিন বা ঘণ্টার। এই বিবৃতি একেবারে প্রেসে চলে গেলো। সমস্ত দেশে উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল। বেশী করে মিটিং হতে লাগলো, মিছিল বেরোতে লাগলো, আর বেশী করে টেলিগ্রাম আসতে লাগলো। ছেচল্লিশ দিনের দিন মিঃ গণেশশঙ্কর বিদ্যাথা এলেন। তিনি এসেছিলেন ছত্রী নবাবের কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে যে আমাদের নিশ্চয়ই শ্রেণীভুক্ত করা হবে—কিন্তু কয়েকদিন সময় লাগবে এই পর্যন্ত। বিদ্যাথাজী আমাদের অনশন ত্যাগ করতে বললেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করবার আগে তিনি সুপার-এর সঙ্গে দেখা করে আমাদের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে এসেছিলেন। রোজ সরকারের কাছে টেলিগ্রাম বা টেলিফোনের মধ্য দিয়ে একটা করে রিপোর্ট যেতো। আমরা তাঁর অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে আমাদের অসামর্থতা জানালাম। আমরা বললাম সরকার কি করে একবার আমাদের ঠকিয়ে ছিল। আমরা এও বললাম যে তাঁর অনুরোধে একবার অনশন ত্যাগ করেছিলাম কিন্তু ফল কি হয়েছিল? তখন তিনি অনশন ত্যাগের অনুরোধ ছেড়ে দিলেন। তিনি বললেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের মাঝে এই শ্রেণী বিভাগ বহু বিরোধের সৃষ্টি করবে বলে তিনি এটা পছন্দ করেন না। এই দিক দিয়ে এটা ঠিক। কিন্তু পাঠক জানেন যে নেতারা সব সময় বিশেষ শ্রেণী-

ভুক্ত হন। নোতুন নিয়ম নেতাদের জন্য বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করেছিল। বহু লোক রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এই বিভেদের নিন্দা করেছেন। আমি নিজেও এটা পছন্দ করিনা! কিন্তু যুক্তি অনুসারে সব রাজনৈতিক নেতা আর বড় বড় নেতাদের বিশেষ ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। এইটে না করে শুধু নিন্দা করাটা সি-শ্রেণী বন্দীদের প্রতি মাত্র শুভ-ইচ্ছা প্রদর্শন ছাড়া কাজের কিছু নয়। এর পরে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রস্তাব উথাপিত হয়েছে, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। এর পরে শেঠজী আমাদের একটা আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা বললেন। তিনি বললেন যে তিনি রায় বেরিলীতে যাচ্ছেন হ্রদের নূনের সন্ধানে। কেন না ওখানেই নূন তৈরীর প্ল্যান হচ্ছে। আমরা বুঝলাম যে বিরাট একটা কিছু দেশে আসছে। এই শেষ আমরা শেঠজীকে দেখি। এর এক বছর পর তিনি হিন্দুমুসলমানের একতার জন্যে জীবন দিয়ে শহীদত্বে উন্নীত হন। বহুলোক বিদ্যাথাজীর অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

বিদ্যাথার মুখে নবাবের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম যে সরকার এবার নামবে। কেবল মর্যাদা রক্ষার জন্য সে নামতে পারছে না। তবুও আমরা বুঝতে পারলাম যে যুদ্ধে জয় এখনও হয়নি। তাছাড়া নবাব বিদ্যার্থী-জীকে যা' বলেছিলেন তার মধ্যে নিরাশাবাদই বেশি ছিল। কেননা তাঁর কথা থেকে বোঝা গেল যে দু'মাসের আগে কিছু ঘটবে না। বিদ্যাথাজীর পরেই গোবিন্দবল্লভ পন্থের কাছ থেকে এই মর্মে টেলিগ্রাফ এলো যে খুব ভালো উৎস থেকে তিনি খবর পেয়েছেন যে আমাদের শ্রেণীভুক্ত করা হবে কাজেই আমরা যেন অনশন ত্যাগ করি। বিদ্যাথাজী আর পন্থজীর খবর থেকে আমরা বুঝলাম যে সরকার এবার ঠিক রাস্তাতেই চলেছে। তবুও কতদিনে যে সরকার এটা কার্যে পরিণত করবে সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ ছিল। আমাদের মতে আমরা আর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারি, কিন্তু মেজর জেফরীর মতে আরও তিন সপ্তাহ আমরা বাঁচবো। সরকার কি ঐ সময়ের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? এটাই হলো আসল প্রশ্ন।

মেজর জেফরীর এক সপ্তাহ কার্যকাল পূর্ণ হয়ে গেল। একজন শিখ ক্যাপ্টেন জি, এস, গীল সুপার হয়ে এলেন। শিখ হলেও তাঁর দাড়ী ছিল না। প্রথম থেকেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। তাঁর স্ত্রী ছিল ইংরেজ, আর মেজর জেফরী আমাদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বললেন যে তিনি একজন ইংরেজ। কেননা বহু বছর তিনি ইংলণ্ডে বাস করেছেন। মেজর ভাণ্ডারীর পর সবাইকেই আমাদের ভদ্রলোক বলে মনে হলো। তাছাড়া একটা খুব খারাপ অবস্থার সময়েই তিনি এসেছিলেন, কাজেই আমাদের সঙ্গে তিনি পৃথক ব্যবহার করতেন। এ কথা বলতেই হবে যে তাঁর ব্যবহার ছিল একেবারে ডাক্তারের মতো।

ইতিমধ্যে বাইরে আন্দোলন খুবই জোরাল হয়ে উঠেছিল। একরাতে বক্সীর অবস্থা খুব খারাপ হলো। ক্যাপ্টেন গিল বুঝলেন যে তাকে এখনি খাওয়ানর দরকার। তিনি তখনি জোর করে খাওয়ানর ব্যবস্থা করতে বললেন। জেলার আর জেল ডাক্তার আমাদের জীবনকে দামী ভাবতেন না। কাজেই তাঁরা এত রাতে সেল খুলতে আপত্তি করলো এবং বললে : দুধ পাওয়া যাবে না। এমন আরও বহু কথা। কিন্তু ক্যাপ্টেন কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। তিনি বললেন যে তিনিই কর্তা, তাঁর কথা শুনতে অন্যেরা বাধ্য। শেষ অবধি নিম্নতম কর্মচারীদের তাঁর কথা শুনতে হলো। বক্সীর সেল খোলা হল, তাকে জোর করে খাওয়ানও হলো। তিনি যে কর্তা এ কথা দেখাতে আমাদের সেল খুলে আমাদেরও জোর করে খাওয়ান হল। নোতুন সুপার-এর ব্যবহারে জেলে চাঞ্চল্য পড়ে গেল, সাড়া পড়ে গেল এই মর্মে যে, যেসব কাকোরী বন্দী কেন্দ্রীয় জেলে অনশন করছিল তাদের একজন মারা গেছেন। তখনি জনসাধারণ মিছিল করে জেল গেটে এল। তারা খুব শ্লোগান দিচ্ছিল। তাদের হাতে প্রচুর মালা ছিল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও তাদের সঙ্গে এলেন। নোতুন সুপার ক্যাপ্টেন গিল তাঁদের বললেন যে ওরকম কিছু ঘটেনি। বন্দীরা সকলেই বেঁচে আছে। কিন্তু জনসাধারণ তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। খুব কষ্ট করেই শেষ অবধি সুপারকে

তাদের এই খবর বিশ্বাস করাতে হলো, তখন তারা ফিরে গেল। জনমত যে কী ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিল সেটা সুদূর কলকাতা আর লাহোরের খবরের কাগজের তদানীন্তন সম্পাদকীয় পড়লেই বোঝা যাবে। লাহোরের উর্দু কাগজ "বন্দেমাতরম্" লিখলো যে যদি মৃত্যু ঘটে তবে রক্তপাত অনিবার্য। আর এ রক্তপাত হবে ন্যায়সঙ্গত। "দৈনিক হিন্দী" লিখলো যে সরকারের মনে রাখা উচিত যে ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তাছাড়া প্রতিদিন শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস নেতারা একটা করে বিবৃতি লিখছিলেন। একদিন রাতে ক্যাপ্টেন গিল এসে বললেন "আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন। আপনাদের মধ্যে যে মিটিং হচ্ছে তার একটায় আজ যোগ দিয়েছিলাম। আমি ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম। একজন বক্তা আমার সম্বন্ধে বললেন যে, আমি নাকি আপনাদের যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি। এই কংগ্রেসের লোকেরা কি খারাপ।" একটু থেমে তিনি আবার বললেন যে "তারা আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দিক। এরপর যখন তারা আসবে তখন তাদের আমাকে আরও গাল দিতে বলবেন।"

এই সময় একটা খবর আমাকে সব খবরের চেয়ে বিচলিত করেছিল। এই খবর এনেছিল চন্দ্রশেখর আজাদ, পার্টির বর্তমান জীবন্ত প্রতীকের কাছ থেকে। আমরা তাঁকে যেমন জানতাম খবরটা ঠিক সেই রকমই ছিল। সে আমাদের বলে পাঠিয়েছিল অনশন ত্যাগ করতে। কেননা সে ভালভাবে জেনেছে যে আমাদের প্রতি এবার ভাল ব্যবহার করা হবে। কিন্তু যদি তা না করা হয় তবে সে বিপ্লবীদের নামে শপথ করে কথা দিচ্ছে যে, কর্নেল পামার, বন্দীদের I, G, আর এ রকম বড় বড় কর্মচারিদের সে তবে গুলি করবে। আমি তাকে এইরকম উত্তর দিলাম: তোমার সংবাদ পেয়ে আমরা খুব বিচলিত হয়েছি। তোমার খবরের জন্যে মৃত্যু আমাদের কাছে সহজ হয়ে এসেছে। আমাদের জন্যে দুঃখ করো না। আমরা এবার কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার কোরবো না, ঠিক করেছি। কাজেই আমরা তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।" শুধু এই একবারই আজাদ রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য করতে চাননি। আমরা তার

প্রিয়তম ছিলাম। তাই আমাদের মৃত্যুর সম্ভাবনায় তার বিচলিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। পরে যখন আইনঅমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় আর বহু স্ত্রীলোক জেলে বন্দী হন, তাঁদের উপর খারাপ ব্যবহার করা হয়, তখনও চন্দ্রশেখর এতে মাথা গলান। এ সময়ে আমাহুল্লা কানপুর জেলের জেলার ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কোন স্ত্রীলোক জেলে আসলে তাঁকে সধবার চিহ্ন সিঁদুর পরতে দেওয়া হবে না বা চুড়ি পরতেও দেওয়া হবে না। তিনি এই হুকুম কার্যকরী করবার জন্যে মেয়েদের উপর জোর করতেন। এতে চন্দ্রশেখরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে আমাহুল্লাকে বলে পাঠাল: যদি তিনি আর বেশিদিন এই অত্যাচার চালান তবে তাঁকে সে গুলি করবে। এতে আশাপ্রদ ফল ফলেছিল। একবার যুক্তপ্রদেশের জেলে একজন আইনঅমান্যকারীকে সামান্য কারণে বেত্রদণ্ড দেওয়াতেও তিনি মাথা গলান। এ সময়ে তিনি কর্নেল পামারকে এই মর্মে চিঠি দেন যে, আর এরকম ব্যবহার করলে তাকে গুলি করা হবে। আমি খুব ভাল করে জানি যে এতেও আশাপ্রদ ফল ফলেছিল। তার নামেই যে বড় বড় কর্মচারিরা ভয় পেয়ে যেত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জোর করে খাওযান সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হয়ে আসছিল। কিন্তু মানসিক কষ্ট ছাড়া শারীরিক কষ্ট বিশেষ ছিল না। আমরা অনুভব করছিলাম যে আমাদের অনুভূতি কমে আসছে। কিন্তু তাকে আমরা কেয়ার করিনি। আমাদের জীবন নিয়ে জুয়োখেলার আনন্দে পেয়ে বসেছিল। এখন আমরা—যেমন করে কৃপণ তার টাকা গোণে তেমনি করে জীবনের বাকি কটা দিনের সংখ্যা গুণ্‌তে আনন্দ পেতাম। আমাদের ক্ষতি হবার ভয় ছিল না। আমাদের এখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে পালাবার উপায় নেই এমন কি পেছনে তাকাবারও উপায় নেই।

পঞ্চাশ দিনের দিন রাজকুমারের অবস্থা খারাপ হলো। এই সময়ে একটা কাটিং পেয়ে আমাদের খুব উৎসাহের সঞ্চার হলো। লক্ষ্ণৌ-এর এসোসিয়েটেড প্রেস খবর জানিয়েছে যে সমস্ত কাকোরী বন্দীদের শ্রেণীভুক্ত করা হবে। সুপারও এসে বললেন যে I. G. র অফিস থেকে ফোনে

জানিয়েছে যে আমাদের শ্রেণীভুক্ত করার হুকুম পাশ হয়েছে। আমরা কাগজে কলমে খবরটা দেখতে চাইলাম।

তিপ্পান্ন দিনের দিন ডাকে খবর এলো। সুপার তখনি এসে আমাদের খবরটা দিল। আমরা তাঁকে আমাদের স্ট্রেচারে করে একটা Cell-এ নিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। কেননা তাতে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। আমাদের একটা সেলে আনা হলো। হুকুমটা খুব অদ্ভুতভাবে দেওয়া হল। লেখা ছিল যে, সমস্ত কাকোরী বন্দীদের 'বি'-শ্রেণীভুক্ত করা হবে। অবশ্য আমরা অনশন ত্যাগ করলেই এটা কার্যকরী হবে। এইটের ওপরে মিথ্যে মর্যাদাবোধের একটা আবরণ দেওয়া ছিল! সরকার নমিত হলেও একটা মিথ্যা মর্যাদাবোধের অভিনয় করছিল। একজন বলল যে সরকার এখনও পুরানো খেলা খেলছে, কিন্তু আমি বললাম যে ভাষায় কিছু এসে যায় না। সরকার কি করে তার এই পরাজয়কে গ্রহণ করলেন আমাদের তাতে মাথাব্যাথার কারণ নেই। আমি অনশন ত্যাগ করবার উপদেশ দিলাম। সেই অনুসারে আমরা অনশন ত্যাগ করলাম। আমি আমাদের দেহে কত দুধ ঢোকান হয়েছে তার একটা পূর্ণ বিবরণ রেখেছিলাম। এই অনুসারে সাত সেরের বেশি দুধ আমরা খাইনি। বাহান্ন দিনের পক্ষে এটা কিছুই নয়। রাজকুমার আর আমি প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে একশত চার পাউণ্ড কমে গিয়েছিলাম। মানে আমাদের ওজনের এক তৃতীয়াংশ ভাগ কমে গিয়েছিলাম। বক্সী আরও বেশি কমেছিল। যাই হোক বাহান্ন দিনের পর আমরা প্রত্যেকে এক গ্লাস করে গরম দুধ খেলাম। ১৯২৭ সালে যে যুদ্ধ আমরা আরম্ভ করেছিলাম, তিন বছর পরে তা সফল হ'ল। কিন্তু কি মূল্যে এই বিজয় আমরা লাভ করলাম! অবশ্য এই বিজয়ে কেবল রাজনৈতিক বন্দীরাই ফল পেল, অন্যান্য বন্দীরা নয়।

১৯৩১ সালের ২৩ শে মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেবের হলো। আর এর পর করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। কংগ্রেসের

সরকারী ঐতিহাসিকের কথায়—"করাচী কংগ্রেস—দেশের আনন্দের মধ্যে যার অধিবেশন হতো, হলো ভগৎ সিং রাজগুরু আর শুকদেবের ফাঁসীর দুঃখময় স্মৃতির মধ্যে। অধিবেশনের ওপরে এই তিনটি বিদেহী যুবকের আত্মা যেন বিপদের সৃষ্টি করলো। বাড়িয়ে না বললেও বলা যায় যে সে সময়ে ভগৎ সিং-এর নাম সারাদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো আর এ নামটি গান্ধীজীর নামের মতোই প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই কানপুরে হিন্দু মুসলমানের একটা দাঙ্গা চলছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের পর থেকেই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ভারতের একটা সাধারণ জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুটো কারণে কানপুরের দাঙ্গা স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমঃ সর্দার আর তাঁর বন্ধুদের ফাঁসীতে একটা হরতাল সংগঠিত হয়। করাচী বোম্বে, কোলকাতা, লাহোর, মাদ্রাজ, দিল্লী আর অন্যান্য সহরে বলতে গেলে সারা ভারতে এটা খুব বড় আকার ধারণ করে। কিন্তু এই উপায়ে কানপুরে এটা হিন্দুমুসলমান দাঙ্গায় পরিণত হয়। এই হরতালের দিন কানপুরে এই তিনজন শহীদের ফটো আর কালো পতাকা নিয়ে একটা মিছিল বেরোয়। হিন্দুরা তাদের দোকান বন্ধ করে দিল কিন্তু মুসলমানরা করলো না। এর আগে মহম্মদ আলি মারা গেলে মুসলমানদের হরতালে হিন্দুরা যোগ দেয়নি। এই পরিস্থিতির অন্য বিবরণের আর দরকার নেই। বারুদ আর দেশলাই দুই ছিল। একজন মুসলমান গুপ্তচর মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন যে হিন্দুরা মুসলমানকে মারছে। এতেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। কাজেই তখনিই বিপ্লবী আবহাওয়া পরিবর্তিত হলো প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে। এটা মুসলমান আর হিন্দুদের দু'জনের পক্ষেই গভীর কলঙ্কের কথা সন্দেহ নেই, কেননা এই পরিস্থিতি বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করা ছিল খুব সোজা।

দ্বিতীয়ঃ এই দাঙ্গাতেই আমাদের বন্ধু গনেশশঙ্কর বিদ্যার্থী মারা যান। হিন্দু দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচাবার মহৎ কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই উদ্ধারকাজের জন্যে তিনি একটা মুসলমানপ্রধান

এলাকায় প্রবেশ করেন। এখানে মুসলমান দাঙ্গাকারীরা নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে। করাচী কংগ্রেসে এঁর মৃত্যুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও অর্পিত হয়।

করাচী কংগ্রেস গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন করলেও এটার প্রয়োগে অনেক অসুবিধা দেখা গেল। শেষে অবশ্য গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠক-এ যোগ দেবার জন্যে লণ্ডন যাত্রা করলেন।

গান্ধীজীর গোল টেবিল বৈঠক নিস্ফল হ'ল। বোম্বেতে আসবার পথেই বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর যুক্তপ্রদেশের অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বর্ণনা করার দরকার নেই। জওহরলালের কথা "গান্ধীজী লণ্ডনেই বাংলা অর্ডিনেন্স-এর কথা শুনলেন এবং এতে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বোম্বেতে নেমে দেখলেন যে যুক্তপ্রদেশে আর সীমান্তের নোতুন অর্ডিনেন্স তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরী হয়েছে। সীমান্তে তাঁর নিকটতম কয়েকজন ধরাও পড়েছেন। শান্তির সব আশাই দূর হলো। তবুও তিনি পথ খোঁজবার চেষ্টা করলেন এবং ভাইসরয় উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করবারও চেষ্টা করলেন। তিনি নিউ দিল্লী থেকে খবর পেলেন যে কয়েকটি সর্তেই এই দেখা হতে পারে। সর্ত হলো এই যে তিনি বাংলা, যুক্তপ্রদেশ আর সীমান্তের আধুনিক ঘটনা আলোচনা করবেন না, গ্রেপ্তার বা অর্ডিনেন্স-এর কথাও আলোচনার বাইরে থাকবে। এবার পরিষ্কারই দেখা গেল যে ভারত সরকার কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চায়, এবং এর সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে চায় না। কার্যকরী সমিতির আইনঅমান্য আন্দোলন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। তাঁরা যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তারের আশা করছিলেন তাই তিনি যাবার আগে দেশকে একটা নির্দেশ দিতে চাঁইলেন। আইনঅমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলে গান্ধীজী ভাইসরয়ের সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা করলেন। সর্তহীনভাবে দেখা করবার জন্যে একটা টেলিগ্রামও করলেন। গান্ধীজী আর কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের গ্রেপ্তার আদেশ এলো সরকারের উত্তর রূপে।" এইভাবে সমস্ত দেশ একটা আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে লণ্ডনে সরকার একটা শাসন-পদ্ধতি রচনা করলেন। ১৯৩২ এর ১৭ই আগস্ট মিঃ ম্যাগ্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা communal award প্রকাশিত হলো। এতে অনুন্নত সম্প্রদায় শুধু পৃথক নির্বাচনই পেলোনা, পেলো বাড়তি ভোট আর সাধারণ নির্বাচনীতে দাঁড়াবার ক্ষমতা। গান্ধীজী লণ্ডনে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম বিভেদ আনলে জীবন দিয়ে বাধা দেবেন। এই অনুসারে জেল থেকে জানালেন যে ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি অনশন আরম্ভ করবেন। গান্ধীজী জেল থেকে এই খবর দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এটাকে লুকিয়ে রাখতে সাহস করলো না। কাজেই জনসাধারণ ঐ খবর পেয়ে গেল। প্রধান মন্ত্রী সিদ্ধান্ত বদলাল না, তবে এটা ঠিক্ হলো যে যদি সব দলগুলি রাজী হয় তবে সিদ্ধান্ত বদলান হবে। গান্ধীজী সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুদের নিয়ে একটা বৈঠক ডেকে একটা ফরমুলা বার করবার চেষ্টা করলেন। এই ফরমূলা award-এ প্রবিষ্ট হলো এবং গান্ধীজী তাঁর অনশন শেষ করলেন।

১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল আমাদের 'বি'-শ্রেণীভুক্ত করা হলে আমাদের তিনটে বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। রাজকুমারকে ২রা মে আগ্রা কেন্দ্রীয় জেলে পাঠান হলো, বক্সীকেও ঐ তারিখে লক্ষ্ণৌ জেলে পাঠান হলো, আমিই রইলাম বেরিলী জেলে। বন্ধুদের এই বদলীতে আমার খুব কষ্ট হলো। বিশেষ ব্যবহারেও আমাদের বদলী বন্ধ হলো না। বদ্‌লি হবার কথা শোনামাত্র আমি অনশনের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এ সময়ে একে আমরা খুব দুর্বল ছিলাম তার ওপর বাইরে বন্ধুদের খবর না দিয়ে অনশন আরম্ভ করার কোনো মানে হয় না। কাজেই ভবিষ্যতের জন্যে এই অপমানটা তোলা রইলো! এটা ঠিক করা হলো যে বদলির আগে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের এক জেলে রাখার জন্যে প্রচার করা হবে। যখন প্রচারটা বেশ পরিপক্কতা লাভ করবে তখন আমরা বিভিন্ন জেল থেকে অনশন আরম্ভ করবো। এই প্রস্তাবটা ভালোই বোধ হলো এবং এর মধ্যে বাস্তবতার গন্ধ ছিল। কিন্তু এটাকে কার্যকরী করা হয়নি। এর পরে আমি

প্রোগ্রাম অনুসারে একটা তারিখ নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং অনশন আরম্ভ করেছিলাম। আমার দাবী ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের 'বি'-শ্রেণীভুক্ত করা এবং এক জেলে সবাইকে রাখা ; কিন্তু অন্যেরা আগের মতো অনশনে যোগ দেয়নি। আমি দ্বাদশ দিন পরে অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করেছিলাম কিন্তু শেষে এই যুদ্ধ যোগেশ চ্যাটার্জী গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা তার ঢের পরের কথা।

ইতিমধ্যে আমরা 'বি'-শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের ছড়িয়ে ফেলা হয়। ভগৎ সিং-এর এবং তার কমরেড্‌দের ফাঁসীর পরে লাহোর বন্দীদের বেশীর ভাগকেই সাধারণ বন্দীরূপে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার অনশন অসফল হলে আমি বদলির জন্যে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম এবং ১৯৩১ সালের আরম্ভেই ফতেগড় কেন্দ্রীয় জেলে নিজেকে বদলী করতে সমর্থ হলাম। সেখানে আমি সঙ্গীরূপে মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে পেয়েছিলাম। রোমাঞ্চকর একটা পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ধরা পড়েন। কাশীতেই তাঁর সঙ্গে আমার মুখচেনা ছিল। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে কোনো-দিন কথা বলিনি। এই সময়ে যদিও আমি আমার ধর্মমতকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলেছিলাম তবুও মণি ব্যানার্জীকে পেয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম।

এখানে সুপার কর্ণেল হলরয়েডের ইচ্ছা ছিল যে রাজনৈতিক বন্দীরা জেল-প্রদত্ত কাজ যথাযথভাবেই সম্পন্ন করবে। আমরা কিছু কাজ করছি না অতএব মাংস হজম করতে পারবো না এই অজুহাতে তিনি আমাদের মাংস দেওয়া বন্ধ করেন। শাস্তিস্বরূপ তিনি আমাদের সমস্ত দেখা সাক্ষাৎ এবং চিঠি সংবাদপত্র প্রভৃতি সবই বন্ধ করেন।

চিঠিপত্র বা দেখাশোনা বন্ধ করায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম সংবাদপত্র বন্ধ করাতে। কেননা তখন প্রতিদিনই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটছিল। আমাদের মাত্র একটা সাপ্তাহিক কাগজ দেওয়া হতো। বেরিলী জেলে আমাদের বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বাইরে কিছু ঘটলে দু' ঘণ্টার মধ্যে আমরা তা জানতে পারতাম। কিন্তু এখানে অবস্থা ছিল

আলাদা। আমি বুঝতেই পারলাম না যে কি আমার করা উচিত। এই সময় দেশের সর্বত্র আইনঅমান্য আন্দোলনের বন্দীদের প্রতি খুব বেশি অত্যাচার করা হচ্ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গেই যোগস্থাপন করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল, জেলের অন্য অংশের বন্দীদের সঙ্গে যোগস্থাপন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একটি বন্দীর শীঘ্রই ছাড়া পাবার কথা ছিল। তার সঙ্গে অনেক কষ্টে যোগাযোগ স্থাপন করলাম। সে ছিল কাশীর লোক। সে ছাড়া পাবার পর আমাদের কষ্টের কথা আমাদের দলের লোকেদের জানাবার কথা ছিল। তার মুক্তির পরই আমরা অনশন করবার ঠিক্ করলাম। আমরা তাকে অনশনের তারিখ জানালাম আর প্রোগ্রাম অনুসারে অনশন আরম্ভ করলাম। এই ছেলেটির নাম সুরনাথ ভাদুড়ী, কাশীতে সে গেল কিন্তু আমাদের দলের লোকদের ঠিকমতো সব জানাল না। যাই হোক্ আমরা আমাদের দাবী জানিয়ে অনশন আরম্ভ করলাম কিন্তু প্রেসে এই খবর গেল না।

কর্ণেল হল্‌রযেড্ জোর করে খাওয়ানোতে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। তিনি বলতেন যে যারা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের জন্য মুখ দিয়ে আহার গ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্যই জোর করে খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে। অনশনকারিরা ইচ্ছা করে খায় না, কাজেই তাদের জোর করে খাওয়ান উচিত নয়। কর্ণেল হল্‌রয়েড্ যে একদিকে ঠিকই বলেছিলেন তাতে ভুল নেই। তিনি—আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, একবার এই যুক্তি অনুসারে কাজ করেছিলেন। একবার একটা অপরাধী ছিল জেলের সরকার। কাজে ক্লান্ত হয়ে সে তার পায়ে একটা কৃত্রিম আঘাতের সৃষ্টি করে। এই আঘাত বিষাক্ত হওয়ায় অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কর্ণেল বললে যে, যেহেতু সে ইচ্ছে করে এই ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেইহেতু তার ডাক্তারি সাহায্য পাওয়া উচিত নয়। কাজেই অপরাধীটির অপারেশন না হওয়ায় সে মারা গেল।

যাই হোক্ আমাদের জোর করে খাওয়ান হলো না। এতে কিন্তু ভালোই হল। কেন না বিশদিন পরে I. G. কর্ণেল পামার যখন তাঁর ষান্মাষিক পরিদর্শনে এলেন তখন আমাদের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক। তিনি আমাদের

প্রতি সহানুভূতি তো দেখালেনই না বরং কেবল আমাদের বক্তৃতা শোনালেন। আমরা কিন্তু অনশন ভাঙ্‌লাম না। তিনি তখন কর্ণেল হল্‌রয়েড্‌কে বললেন যে এরকম বেশীদিন চলবে না। কেননা সরকার আমাদের হত্যা করতে চায় না। পরদিন জেল কর্ত্তৃপক্ষ আর আমাদের মধ্যে একটী মিট্‌মাট্‌ হলো। এই চুক্তি অনুসারে আমরা কাজ করতে অরাজী হব না, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের কাজের জন্য জোর দেবেন না। আমাদের কাগজ দেখা, সাক্ষাত করা আর চিঠিপত্র দেওয়া হবে। এটা নিশ্চয়ই খুব বড় বিষয়। আমরা যতদিন সেখানে ছিলাম, 'বি'-শ্রেণীর বন্দীদের ততদিন কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় নি। এবারে জেলের 'সি'-শ্রেণীর বন্দীদের কথা বলা যাক্‌। ১৯৩১ সালে আমি যখন ফতেগড়ে পঁহুছই তখন জেলে আমরা দু'জন ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক বন্দী ছিলাম না। কিন্তু ক্রমশঃ 'সি'-শ্রেণীতে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর আমদানী হয়। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানপুরের রমেশচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর দশবার সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি জেলের কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই জ্বালাতন করতেন। তিনি 'বি'-শ্রেণীর বন্দী ছিলেন। মণি ব্যানার্জ্জী ও আমি তাঁকে সঙ্গী পেয়ে খুব খুসী হলাম। তিনি ১৯২৯ সনের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর কাছে লর্ড আরউইনের ট্রেনকে বোমা ছুঁড়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে দায়ী হন। তারপর তিনি আত্মগোপন করেন। তিনি আইরিশ ভদ্রমহিলা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে ধরা পড়েন। ভীষণ যুদ্ধের পরে তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁর চোদ্দবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ভগৎ সিং-এর আগের যুগে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান বিপ্লবী। বিপ্লবী হিসাবে তাঁর জীবন ছিল খুব রোমাঞ্চকর!

যদিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের জেলের রাজনৈতিক আর সবরকম বন্দীদের থেকে আমাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, তবুও রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আমরা কথা চলাচল করতাম। রমেশ আর রনধীর আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ড্রেন দয়ে কথাবার্তা বলতো। কয়েকমাস আমরা কাউকে দেখতে না পেয়েই খালি কথাবার্তা বলতাম। সাধারণতঃ জেলের সব রাজনৈতিক বন্দীরা আমাদের দিকে উপদেশ, খবর আর সাহায্যের জন্যে চেয়ে থাকত। মণীন্দ্র

ব্যানার্জী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যশপালও ছিলেন তেমনি। কাজেই 'সি'-শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে আমাকেই কথাবার্তা চালাতে হতো। মণীন্দ্র ব্যানার্জী ভাষা শিখতেন। আমরা দু'জনাই ভাষাশিক্ষা করতাম। আমাদের তিনজনকে যদি এক সঙ্গে রাখা হতো তবে আমাদের জীবন সুখেই কাটত। কিন্তু 'সি'-শ্রেণীর বন্দীদের ওপর খারাপ ব্যবহারের খবরে আমাদের মনের শান্তি চলে গেল। লেড্‌লী প্রধান জেলার হওয়ায় এই খবর আরও বেশি করে' যেতে লাগল। আমরা একদিন খবর পেলাম যে চন্দ্রমা সিং বলে একটী রাজনৈতিক বন্দী লেড্‌লীর খারাপ ব্যাবহারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করেছে। চন্দ্রমাকে স্থানীয় কোর্টে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তাঁকে টিপসই দিতে বলা হল। সে আপত্তি করায় তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনান হলো যে সে আদালতের হুকুম মানে নি। মিঃ লেড্‌লীর বন্দী জেলে কি করেছে এ বিষয় দেখবার কথা নয়। আদালত অসহায় নয়। সে তাকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু মিষ্টার লেড্‌লী চন্দ্রমার ব্যবহারকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করলেন এবং চন্দ্রমাকে আধমরা করে ফেললেন। চন্দ্রমা এতে বিরক্ত হয়ে অনশন আরম্ভ করলো।

লেড্‌লীর অত্যাচার আর সেই সঙ্গে চন্দ্রমার অনশনের খবর আমাদের খুব বিচলিত করে তুললো। আমরা কি করবো সে বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। এরপরে যখন রমেশকে পৃথক কারাবাসে বেড়ি আর শস্য-পেষায় নিযুক্ত করা হলো, আমরা তখন আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমাদের নিজেদের অভিযোগ কিছু ছিল না, কিন্তু 'সি'-শ্রেণীর বন্দীর দুঃখের কথায় আমরা খুব বিচলিত হলাম। বহু পরামর্শের পর সব রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন আরম্ভ স্থির হলো। তিন চার দিনের মধ্যেই আমাদের তিনজনকে সরিয়ে ফেলা হ'ল। আমাকে আর একটা circle এর সেলে নিয়ে যাওয়া হলো। মণীন্দ্রের স্বাস্থ্য সবচেয়ে খারাপ হওয়ায় তাকে আগের জায়গাতেই রাখা হলো। যশপালকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো। কিন্তু 'সি'-শ্রেণীর বন্দীদের তুলনায় এ শাস্তিটা কিছুই নয়। তারা প্রত্যেকেই যুবক ছিল এবং অনশন ত্যাগ না করলে তা'দের Sadoingএর ভয় দেখান হলো। প্রকৃতপক্ষে

এটা শুধু হুম্‌কিই ছিল না, কেননা কয়েকজন খারাপ চরিত্রের লোক আনিয়ে একজন কমরেডের দেহ থেকে কাপড় সরিয়ে নেওয়া হলো! কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিঃ যোসেফ, খৃস্টান জেলার এসে বললেন যে এই দোষে মারার দায়িত্ব তিনি নেবেন না, কাজেই লেড্‌লীকে থামতে হ'ল। কে জানে মিঃ লেড্‌লী আর যোসেফ্ দুজনেই এই প্ল্যান করেছিল কিনা। এ ব্যাপারেও তারা সফল হলো না, কেননা তাদের প্ল্যান অনুযায়ী ফল ফললো না। ছেলেরা দৃঢ় রইলো। লেড্‌লী তখন আর একটা উপায় বার করলো। যেখানে 'সি'-শ্রেণীর অনশনকারিরা ছিল সেখানে সে জেলের ডাক্তারের সঙ্গে গেল এবং ডাক্তারকে তাদের পরীক্ষা করতে বললো। পরীক্ষা করে ডাক্তার জানাল যে তারা বেত্রদণ্ড পাবার যোগ্য। কমরেড্‌রা সকলে বেত খাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তবুও নিজেদের পক্ষে দৃঢ় থাকবার জন্যে তারা স্থির রইল। সকালে circleএ বেত আর অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় জিনিষ আনা হলো। কমরেডদের সেল থেকে এনে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হলো। তবুও তারা খেতে রাজী হলো না। শেষ অবধি বেত প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সপ্তম দিনে শুনলাম যে কয়েকজন কমরেড্ দুর্বলতা দেখাচ্ছেন এবং তাঁদের অবস্থাও খুব খারাপ। একজন বোধ হয় অনশন ত্যাগই করেছে। আমি বারবার খবর পেলাম যে মণির স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ছে। অষ্টম দিবসের বিকালে ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল। কেননা চন্দ্রমা সিংই প্রথম অনশন ত্যাগ করে খাবার খেলো। আমি এত অবাক হয়ে গেলাম যে প্রথম তো বিশ্বাস করতেই রাজী হলাম না। আমি জানলাম যে কর্তৃপক্ষ আমাদের বোকা বানাচ্ছেন। কিন্তু বিকেল নাগাদ বুঝলাম যে ব্যাপারটা ঠিকই। স্বভাবতই এরপর অনশন ভেঙে যাবার কথা। সব ঘটনাটা ভেবে নিয়ে আমি অনশন ত্যাগ করবার উপদেশ দিলাম! আমার নির্জন সেল থেকে লেড্‌লীকে খবর পাঠালাম যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি অনশন ত্যাগ করার বিষয় আলোচনা করতে চাই। সংক্ষেপে, নবমদিনে আমরা অনশন ত্যাগ করলাম।

মণির শরীর সত্যিই ভেঙ্গে গিয়েছিল। দিনের পর দিন সেটা আরও

খারাপ হতে লাগলো। এক এক সময়ে মনে হত বুঝি সে সেরে উঠছে। কিন্তু বৃথা। তার স্বাস্থ্য সত্যিই নষ্ট হয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার অসুস্থতার দিকে নজরও দিল না। তবে অসুখ বাড়ায় সে যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো তখনই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পরীক্ষায় দেখা গেল যে তার প্রস্রাবে এ্যালবুমেন আছে। তারপরে ১৯৩৪ সালে ২০শে জুন এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে তার মৃত্যু হল। আমি ২০শে জুন যে ডায়েরিটা লিখেছিলাম তার থেকে এখানে উদ্ধৃত করবো।

১৯৩৪ সালের ২০শে জুন অন্য সবদিনের মতোই আরম্ভ হলো। শুধু তফাৎ ছিল এই যে মণি আমার পাশে ছিল না, ছিল হাসপাতালে। তার বিচ্ছেদ আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, কেননা আজ সওয়া তিন বছর ধরে তার সঙ্গে আমি একত্রে ছিলাম। শুধু একত্রই ছিলাম না, তাকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম। একজন দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীর পক্ষে তার বিপ্লবী সঙ্গী যে কতটা প্রিয়তম হতে পারে তা' একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। নির্জন কারাবাসে বন্ধু শুধু বন্ধুই থাকে না, জীবনের একটা প্রধান অংশ হয়ে যায়।

মণি যদিও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল, কিন্তু তবুও আমি তার জন্যে বিশেষ চিন্তিত হই নি। কেননা আমি এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিনি যে এ যাত্রায় সে সেরে উঠ্‌বে না। যদি আমাকে তার রোগশয্যার পাশে থেকে সেবা করতে দেওয়া হতো, তবে আমি বড় সুখী হতাম। কিন্তু আমি কয়েদী, পরাধীন, এ বিলাসিতার কল্পনা করা আমার পক্ষে সাজে না। পরে আমি যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমাকে যদি বরাবর তার রোগশয্যার পাশে থাকতে দেওয়া হতো, তবে আর কিছু না হোক্ অনেক অপ্রয়োজনীয় কষ্টের আর অসুবিধার হাত হতে সে রক্ষা পেত। মণির নিজের মুখেই শুনলাম যে সে গতরাত্রে এসে (মঙ্গলবার) একবার জল চায়, কিন্তু যে কয়েদী তার শুশ্রূষা আর তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিল, সে তখন সুখনিদ্রায় নিমগ্ন থাকায় জলের বদলে তার নাসিকা-গর্জনই মণিকে অভিনন্দিত করে। তার ফলে তাকে জাগাবার জন্যে মণিকে

তার সামান্য শক্তির সবটুকু একত্র করে তার হাতের কাছের একটা বোতল ছুঁড়তে হয়। যখন আমি মণির সে সময়ের মানসিক অবস্থা কল্পনা করি, আর যখন ভাবি যে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বার বার একটু জল চেয়েও সে পায় নি, তখন কে জানে কেন আমি কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারি না। কিন্তু এটাতো জেলের জীবনের বহুবার সংঘটিত একটা ঘটনামাত্র। এরকম সহস্র সহস্র ঘটনা মণির জীবনে গত দু'বছর ঘটেছে। শুধু কি মণির জীবনেই ঘটেছে? তা নয়। তবে মণির ভাগেই একটু বেশি পড়েছিল। এ কথা মানতেই হবে যে জীবনের সমস্ত যুদ্ধ তাকে একাই লড়তে হয়েছিল। জেল-সাজা সে পেয়েছিল এক ডজনবার, বহুবার অনশনও তাকে করতে হয়। তবু তো সে দমিত হয় নি!

সে-রাতে বোতলভাঙার ফলে অবশ্য মণি জল পেয়েছিল। মণির এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে এই পেশাদারী মমতাহীন সেবা যে কতটা দায়ী তা আজ কে নির্ণয় করবে? কিন্তু এতে যে তার মৃত্যু কত কষ্টদায়কভাবে এসেছিল আজ-ও তা আমি ভুলতে পারছি না।

যাক্ আগেই বলেছি যে ২০শে জুন সাধারণ ভাবেই আরম্ভ হলো। আগের দিন বিকেলে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমি তাতে আধঘণ্টা ভিজে খুব নেয়েছিলাম! মণি আর আর বছর এসময়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাইত, তাই এবার বৃষ্টিতে নাইবার সময় তার অভাব আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে শীঘ্রই সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে একথা ভেবে আমি নিজেকে বিশেষ বিষণ্ণ হতে দিইনি। আমার শরীরটা অনেকদিন পর সুস্থ বোধ হচ্ছিল। নানা কারণে আমার মানসিক অবস্থা একমাস থেকে ভালো যাচ্ছিল না, আজও মন আমার সেই রকমই ছিল। এতবড় অনর্থ যে আজ ঘট্‌তে যাচ্ছে তার বিষয়ে কোনো পূর্বজ্ঞানই আমার ছিল না। বর্ষার কোমল স্পর্শে আমার মনের শূন্যতা খানিকটা স্নিগ্ধ হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই আঘাতটা আমার পক্ষে এত সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল। রনধীর সিং আর যশপাল না থাকলে আমি বোধ হয় এ-আঘাত সহ্য করতেই পারতাম না। রনধীরের সহানুভূতি এ সময়ে আমার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়েছিল।

মণিকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো সে দিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। 'বি'-শ্রেণীর ব্যারাকে মণির আর আমার "খাটিয়া" পাশাপাশি রাখা ছিল। গত তিন বছর থেকে আমার আর তার বিছানা আমি পৌনে তিন হাত দূরে দেখতে অভ্যস্থ। রোজ সকালে আমার ওঠার আধ ঘণ্টা পরে মণি উঠতো। আমি ইতিমধ্যে মুখটুখ ধুয়ে ব্যারাকসংলগ্ন ছোট বাগানটায় হয় পায়চারি করতাম না হয় ব্যায়াম করতাম। প্রায় কয়েক মাস থেকেই মণি আর আমার সঙ্গে ব্যায়াম করতে পারতো না, বাগানে এসে চুপ্‌টি করে বসে থাকতো এবং কোথায় কোন ফুলের গাছ পুঁতবে তার বিষয়ে আলোচনা করতো। আমি রোজ তাজা তাজা ফুল তুলে তার হাতে গুঁজে দিতাম। সে একটু মুচ্‌কে হাসতো। মণির কড়া হুকুম ছিল যে কেউ তার বাগানের ফুল তুলতে পারবে না। আমি এ-হুকুমটায় বিশেষ খুসী হই নি, এবং রোজ সকালে তার সামনেই তার হুকুম অমান্য করতাম। তাই তার এই হাসি। হাসির মানে হলো—"আরে দুষ্টু!" মণি এইভাবে তার মন্মথকে চিরদিনই সব কাজে ক্ষমা করে গেছে।

১৬ই জুন, বেলা আটটা বা ন'টার সময় মণিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার রাত্রিটা তার অত্যন্ত খারাপ গিয়েছিল, একবার বমি আর দুবার দাস্ত হয়েছিল। মণি সে রাতে আমার খাটিয়ার এক হাতের মধ্যে হাসপাতালের লোহার খাটে শুয়েছিল। তার হাত পা একটু ফুলেছিল। শুক্রবার থেকে তার নিঃশ্বাসের কষ্ট এত বেড়ে যায় যে শোয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর যতদিন সে বেঁচেছিল, একদিনও সে শুতে পারে নি। বসে বসেই তাকে দিনরাত কাটাতে হয়েছিল। শুক্রবার আমাকেও তার সঙ্গে একরকম জেগেই কাটাতে হয়। আমি তখন অনশনের দরুণ অত্যন্ত দুর্বল ছিলাম, কিন্তু পারতপক্ষে তার কোনো কষ্ট হতে দিইনি। বরাবর আমি, রমেশ, রনধীর বা যশপাল যদি তার শুশ্রূষা করতে পেতাম তবে হয়তো এত শীঘ্র সে চলে যেত না। কিন্তু এখন এসব বলা বৃথা। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেও এ ভুলের যে পুনরাবৃত্তি হবে না একথাই বা কে বলতে পারে।

১৬ই জুন ভোরবেলা থেকে আমি মণির কাছে বসেছিলাম, তার অবস্থা

রাতের চেয়ে একটু ভালো মনে হচ্ছিল, কিন্তু শুতে সে পারছিল না। ঠেসান দিয়ে বসে বসেই তার রাত্রি প্রভাত হয়েছিল। হাসপাতালে যাবার পরই যে তার অবস্থা কেন এত খারাপ হলো আমি বুঝতে পারছি না। মণি পূব দিকের বাগানের দিকে মুখ করে বসেছিল। এই বাগানটি প্রধানতঃ তারই হাতে গড়া। বাগানের পরিচালন আর সজ্জা নিয়ে তার সঙ্গে কত বচসাই না আমার হয়েছে! প্রত্যেকটি ফুলের চারার একটা ইতিহাস আছে, এবং মণি সেটা জানতো। ঠিক্ আমাদের জান্‌লার সামনে মণি একটা বেলী গাছ পুঁতেছিল, সে বলতো ফুল ফুটলে আমরা তার গন্ধ পাব। মণির মৃত্যুর পর ঐ ফুলের গন্ধে আমার কেমন যেন কণ্ঠরোধ হত।

বেলা নটার সময় হাসপাতাল থেকে যখন লাল ক্রশ চিহ্নিত স্ট্রেচার আর চারজন লোক এলো, মণির সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আমি তখন যেন চোখে অন্ধকার দেখলাম। মণি দরজার দিকে পেছুন ফিরে বসেছিল, তাই সে তাদের দেখতে পায়নি। আমি তাকে এই কথা জানানো মাত্র ব্যাকুল হয়ে সে আমার হাতদুটো চেপে ধরলো। সেই হাত ধরাটার মধ্যে তার বিচ্ছেদ ব্যাকুল মনের সব ব্যাকুলতাই যেন ঝরে পড়লো। আজ (২৫শে জুন) আমি যখন তার সেই ব্যাকুলতার আর তার সেই অতুলনীয় বড় বড় চোখ দুটোর ত্রস্তভাব মনে করেছি, সুগভীর ধিক্কারে আমার অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে উঠ্‌ছে। নিজেকেই বারবার জিজ্ঞেস করছি, "আজ পাঁচদিন হলো সে চলে গেছে। তার এই দীর্ঘ বিরহ আমি কি করে সহ্য করছি?" বারবার মনে হচ্ছে তার বদলে আমি কেন গেলাম না? আমার জন্যে কাঁদবার তো কেউ ছিল না!

আমরা যতটা পারি দেরী করলাম। বারবার বলতে ইচ্ছে করছিল— "যেতে নাহি দিব"—কিন্তু "তবু হায় যেতে দিতে হয়।" তখন কি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে এই তার অগস্ত্য যাত্রা? মণিকে আমি অতি সন্তর্পনে কোলে করে' স্ট্রেচারে তুলে দিলাম। পরে বাহক ছোকরাদের কি করে স্ট্রেচার নিয়ে যেতে হবে সে বিসয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিলাম। আমাদের পরস্পরের হাত সংযুক্তই ছিল, কিন্তু এবার জমাদার বলল—"তা' হলে এবার"—তখন

আমার দুটি চোখ হঠাৎ ভিজে উঠলো। বুকের মধ্যে কি যেন একটা ঠেলে উঠ্‌তে লাগলো। মণি, যতক্ষণ দেখা যায় তার সরল সুন্দর রোগকাতর দুটি বিশাল চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এই তার শেষ দেখা। এরপরে তার শেষ সময়ে কর্তৃপক্ষ যখন তার পাশে আমাকে বসবার অনুমতি দিলেন তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে তখন তার সুন্দর চোখদুটি দৃষ্টিহীন অবস্থায় অসহায়ভাবে চতুর্দিক হাতড়াচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না।

স্ট্রেচারে তোলা হলো। আমার গণ্ডীবদ্ধ সীমানায় যতদূর যাওয়া সম্ভব গেলাম। আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের পরস্পরের হাত আমরা ছেড়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম—"মণি ভাই, যদি আমি কিছু অপরাধ করে থাকি মাপ করো।" মণি একথার উত্তর দিল না। উত্তর তার প্রযোজনও ছিল না। সে শুধু বললে, "ভাই, অত ঘাবড়ে যেয়ো না, একটু ভাল হলেই আমি আবার আসবো।" কী আশ্চর্য! সে সাংঘাতিক রুগ্ন অবস্থায হাসপাতালে যাচ্ছে, কোথায় আমি তাকে সান্ত্বনা দেব না সেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল! সেদিন বিকেল বেলায়ও সে আমাকে হাস-পাতাল থেকে এইরকম একটা সান্ত্বনাদাযক খবর পাঠিযেছিল, "বাবুকে গিযে বলবে যে আমি একটু ভালো হলেই আসবো এবং তাকে ঘাবড়াতে নিষেধ করো।" বাইরের লোকেরা একথা শুনে অবাক কিন্তু মণির পক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সে আমাকে খুব ভালো করেই জানতো যে নিজের বন্ধুদের ব্যাপারে আমরা কত দুর্বল ও আত্মহারা হযে পড়ি।

এরপর মণির কাছ থেকে আর একটা খবর পাই এই মর্মে যে তার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে, তার মাকে সে তার করেছে।

তারপর ২০শে জুনের কথা। এই কয়েকদিনের মধ্যে তার অবস্থা কেন খারাপ হয়ে গেল, সেটা রহস্যাবৃত।

আগেই বলেছি অন্যসব দিনের মতোই ২০শে জুন এলো। কিন্তু এই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটির পেছনে যে এতবড় একটা অনর্থ ওৎ পেতে ছিল, সে

বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। আমি অভ্যাসমত রোজকার কাজ করে যাচ্ছিলাম। বেলা আন্দাজ ৯টার সময় আমি একটা জার্নাল সামনে রেখে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম। ভাবনার বহু কারণও ছিল। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে শ্রীরনধীর সিং, শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত আর আমি, রাজনৈতিক বন্দীদের কুঠরী বাস, মনির অসুখ, আমার অসহায় অবস্থা এই সব মিলিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম। মনটা বিষণ্ণ ছিল, শত চিন্তার অক্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ। যাক্ আমি বই পড়ছিলাম এমন সময়, নম্বরদার এসে খবর দিল যে জেলর মিঃ লেড্‌লী 'বি'-শ্রেণীতে আসছেন। তাঁর অসময়ে আসবার কারণটা অনুমান করছি এমন সময় তিনি নিজেই এসে পড়লেন।

আমি ও আমার সঙ্গী মিঃ যশপাল তাঁর মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকালাম। তিনিও ভনিতা না করেই আরম্ভ করলেন, "মিষ্টার ব্যানার্জীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আপনারা কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?" আমরা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠ্‌লাম, "অবশ্য অবশ্য, কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। যশপাল মিঃ লেড্‌লীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা মিঃ লেড্‌লীর সঙ্গে হাসপাতালে যাবার জন্যে রওনা হলাম। পথে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করায় মিঃ লেড্‌লী বললেন "আগামী দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জীর মৃত্যু নিশ্চিত।" এরপর তিনি আরও কিছু বললেন কিন্তু তা কিছুই শুনিনি। কোনো দিকে না তাকিয়ে আমি সোজা হাসপাতালে পৌঁছলাম। হাসপাতালে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার তো প্রাণ শুকিয়ে গেল। দেখলাম মনি খালি গায়ে দুটো বালিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে। ঝরাফুলের ম্লানিমা আর ক্লান্তি তার মুখে। তার শুশ্রূষাকারী দূরে নির্লিপ্তভাবে বসে আছে। সব পেশাদারী ব্যাপার, কারুর মুখে কোনো উদ্বিগ্নতা বা সহানুভূতি দেখা যাচ্ছিল না।

আমি একবার চোখ বুলিয়েই ব্যাপরটা বুঝেছিলাম। তারপর মনির খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার ভুল কিনা জানি না,

কিন্তু মনির মুখের কাতর ভাবটা মুহূর্তের জন্যে মিলিয়ে গেল। সে যেন তার স্বভাবজাত বুদ্ধি বশে বুঝলো যে আমি তাকে ধরে আছি। আমি জোরে জোরে ডাকলাম—"মণি ভাই, আমি এসেছি! আমি, আমি, তোমার মন্মথ।"

আমার স্বরও যে এত কোমল হতে পারে তা আমাকে ধারণা ছিল না। মণি বললে, "হ্যাঁ, চিনেছি, তুমি মন্মথ। ভাই আমি কাঁপছি, তুমি আমাকে ধরে থাক! যেতে দিও না আমাকে!" আমি সমস্ত হৃদযাবেগ চেপে রেখে তাকে সাহস দিলাম। জোর দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম, যে শেঠ দামোদর কী রকম করে ১১২ পাউণ্ড থেকে ৬২ পাউণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর তো এক চামচ ফলের রসও হজম হতো না। রাজকুমার সিংহ কী রকম করে বেরিলীতে এত অসুস্থ হয়েছিল যে এক চামচ হরলিক্স তার সারাদিনে হজম হতো না, তবুও তো তারা মরেনি। বেশ সুস্থ শরীরেই জীবিত আছে। মণি এসব ব্যাপার বেশ ভালোভাবেই জানতো, কাজেই সে এসব শুনে জোর খানিকটা পেল। আমি দেখলাম সে যশপালের উপস্থিতি এখনও বুঝতে পারেনি, আমি তাই বললাম—"মণি, মিষ্টার পাল তোমার পাশে বসে আছেন, দেখতে পাচ্ছ না?"

মণি একথা শুনে চোখ মেলে চাইল, কিন্তু পরক্ষণেই ঠাহর করতে না পেরে ক্লান্তভাবে বললে, "না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বাঁ চোখে তো কিছুই নয়, ডান চোখেও ঝাপসা দেখছি।"

তার এই কথা শুনে আমার হাত আপনিই অবশ হয়ে এল। মিঃ যশপাল তাড়াতাড়ি মণিকে ধরে ফেললেন। আমি খাট থেকে সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। মিঃ লেড্‌লীর সামনেই আমি কামিজ খুলে ফেললাম। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাব, কিন্তু জীবনে কখনও অজ্ঞান হইনি, কাজেই সেদিনও সামলে নিলাম। কিন্তু দু'চার মিনিটের মধ্যে আমার অন্তরের বিপ্লবীটা জেগে উঠে আমাকে স্থির থাকতে সাহায্য করলো। সেদিন—মণির জীবিতকালের মধ্যে আর আমি বিচলিত হইনি।

মণিকে জড়িয়ে ধরে মিঃ লেড্‌লীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এঁর বাড়ীর লোকদের খবর দেওয়া হয়েছে কি না। আমাকে জানান হলো যে কাশীতে

একখানা তার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হলাম যে তা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এও বললাম যে তারের wordingsগুলো ঠিক হয়নি, সঙ্কট অবস্থাটা স্পষ্ট হয়নি এতে। যাক্ তর্কাতর্কির ফলে মিঃ লেড্‌লী দু' তিনখানা তার সরকারী খরচে পাঠাতে রাজী হলেন। এর ফলে মীরাট, এলাহাবাদ আর কাশীতে 'তার' পাঠান হলো। 'তার' দেওয়ার পর আমি মিঃ লেড্‌লাকে খবর দিলাম যে I. G-কে কি রকম কী রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আমাকে তিনি বললেন যে তিনি ভালোই লিখেছেন। "ভালো কথা। কিন্তু মণিকে বহুপূর্বেই মুক্ত করে দেওয়া উচিত ছিল। অনেক কয়েদীই এরকমভাবে মুক্ত হয়। আপনি জানেন মণির যদি কিছু ভালো মন্দ হয় তবে জনতা সন্দেহ করবে। আর তার ফলে একটা কমিশন বসাও আশ্চর্য নয়। আপনি জানেন বোধ হয় যে লক্ষ্ণৌ জেলে যখন অন্তধবিহারী মারা যায় তখন কি হয়েছিল।"

এইভাবে কতক গম্ভীর, কতক রেগে আমি মিঃ লেড্‌লীকে কয়েকটা সত্যি কথা বলেছিলাম। মিঃ লেড্‌লীও আল্‌গোছে তার উত্তর দিচ্ছিলেন। মণি আমাদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। যশপাল আর আমি মণিকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে নানারকম কথা বলছিলাম। বলা চলে যে আমরা একটু অভিনয়ও করছিলাম। মণির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝা গেল যে সকালবেলা ফরক্কাবাদের সিভিল সার্জন মিঃ গোলাম মর্ত্তজা মেজর ভাণ্ডারীর সঙ্গে মণিকে পরীক্ষা করে দুটো ইনজেক্‌শন দিয়ে গেছেন। মিঃ লেড্‌লী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন যে তিনি ইনজেক্‌সনের বিষয় কিছু জানেন না। কিন্তু মণি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলায় তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন যে তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যশপাল আর আমি তখন মণির হাত পরীক্ষা করে দেখলাম যে স্পষ্ট ইনজেক্‌শনের দাগ রয়েছে। একটু সন্দেহ হলো। কিন্তু আমি বললাম যে বোধ হয় পিট্রুটিন প্রবেশ করান হয়েছে। আমরা সবাই ভাবলাম যে এই অনুমানটাই ঠিক, মণি কিন্তু বললে যে এই ইনজেক্‌সনে তার অপকার কিছুই হয়নি।

আন্দাজ এগারোটার সময় মণির অবস্থাটা কিছু ভালো হলো। আমি বরাবর মণিকে জড়িয়ে বসেছিলাম। তার কোঁকড়ান চুলে, গায়ে পরম স্নেহে

আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। সে পরম আরামে আমার এই আদরটা গ্রহণ করছিল। কিন্তু শ্বাস কষ্টটা বেশী হলেই সে আমার আর যশপালের হাত ছাড়িয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করছিল আর বার বার অসহায়ভাবে বলছিল, "আর পারি না, আর পারি না, আর যে পারি না।" যশপাল তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর ইংরেজীতে মাঝে মাঝে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। মণি এই সময় বললে যে তার কোন মামারও মৃত্যুর আগে এরকম হয়েছিল, সেও আর বাঁচবে না। আমি বার বার ব্যাকুল হয়ে তাকে বোঝাচ্ছিলাম, "মণি ভাই, তুমি যে বিপ্লবী, তোমার অনেক কাজ যে বাকী আছে, এরি মধ্যে তোমার চলে গেলে তো চলবে না।" মণি যেন কিছু চিন্তা করলো। তার দৃষ্টিহীন বিশাল চোখদুটি একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে সে বললো "ভাই মরতে আমি ভীত নই। কোনোকালে ছিলামও না। আমার দুঃখ এই যে আমি রোগে মরছি।" মণি কিন্তু রোগে মরছিল না। দুটো মহান উদ্দেশ্যের জন্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছিল। তার দীর্ঘদণ্ড আর অনশনই তার মৃত্যুর কারণ। অনশন সে করেছিল রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে, আর জেলে সে এসেছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্যে।

সে তো নিজে 'বি'-শ্রেণীতে ছিল তবু 'সি'-শ্রেণীর দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে উঠলো কেন? তার এই সহানুভূতির জন্যেই না সে শহীদ হলো! আমি তাকে সেদিন জানাই রণধীর সিং, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি এ জেলের বিপ্লবী বন্দীরা তার শুশ্রূষা করতে উন্মুখ, কিন্তু তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বেলা বারোটার কাছাকাছি আমরা বুঝলাম যে মণির অবস্থা যতটা খারাপ বলা হয়েছিল ততটা নয়। কাজেই আমরা এক এক জন করে নেয়ে খেয়ে আসার উদ্যোগ করলাম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে কোনরকমে নেয়ে দুটো নাকে-চোখে-মুখে গুঁজে আবার মণির কাছে ফিরে গেলাম।

আমার কয়েক মিনিটের অনুপস্থিতিতেই মণি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সে বার বার যশপালকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। তাই আমাকে দেখতে পেয়েই যশপাল বলে উঠলেন, "আপনি স্থির হন, ঐ তো মন্মথবাবু আসছেন। আমি ছুটে গিয়ে মণিকে আবার জড়িয়ে ধরলাম, আবার আরম্ভ হলো যমের

সঙ্গে লড়াই। মণির কয়েদী তত্ত্বাবধায়ক আমাদের দেখে লজ্জিত হয়ে সেও মণির গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। আমি মণিকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলাম—"এই যে আমি এসেছি ভাই!" মনে মনে আমি তখন তার পাশ ছাড়বার জন্যে বার বার অনুতাপ করছিলাম। মণি বললো—"এখানে আর আমার কে আছে। তুমিই আমার একমাত্র আপন।" এ ছাড়াও সে বহু কথা আমাকে বললে। আমি একান্ত গোপনে অন্তরের মণিকোঠায় সেগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছি; সে জিনিষ একান্ত আমার—বাইরের কারুর তাতে দাবী নেই। তার মা বা ভাই এসে পড়াতেও অনেক কথা সে আমাকে বলে গেছে। বারবার সে "মাগো" "মাগো" বলে ছট্‌ফট্‌ করছিল।

এরপর যশপাল আর সুবাদার ফিরে এলো। অক্সিজেন পনেরো মিনিটের মধ্যে ফুসফুসে ঢোকান হ'ল। কিন্তু ফল কিছু হলো না।...মণিকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। তার মৃত্যুর পরেই মেজর ভাণ্ডারী এলেন, তাঁকে মণির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে কাশী আর এলাহাবাদে তার করতে বললাম। কিন্তু নানা ওজর দেখিয়ে তিনি অস্বীকৃত হলেন। তারপর আমাদের ব্যারাকে যাবার আজ্ঞা দেওয়া হলো। মণির প্রাণহীন দেহ বোধ হয় মেথর দিয়ে তুলিয়ে মূর্দা ঘরে রাখা হলো। রাতে এই মূর্দা ঘরে জনমানব তো দূরে থাকুক একটা আলো পর্যন্ত থাকে না। বাইরে থেকে প্রকাণ্ড একটা জঙ্গা তালা দেওয়া থাকে। এখান থেকেই মণির মা পরদিন তার দেহ উদ্ধার করেন। পরের দিন রমেশচন্দ্র মণিকে তার শেষ-সম্মান জ্ঞাপন করবার ইচ্ছা জানিয়ে বিফল হয়। প্রভাস যেভাবে মণির দেহের সৎকার করলো তাতে কোথাও শহীদের মর্যাদা রক্ষিত হলো না। তার সৎকার দেশের লোকের শ্রদ্ধাপুর্ণ চোখের সামনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মণির জন্যে একটা শোকসভাও হয়নি। অবশ্য তাঁর জেলের সাথীরা তাঁর জন্যে শোক করেছেন, করবেনও। রনধীর সিং আমাকে পরের দিন জানালেন যে, "আমার মনে হচ্ছে আমার হৃদয়ের গতি যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।" এই ছেলেটি বড়ই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। একলা থাকায় এ বেচারাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিল না। সাধারণ কয়েদীরাও শোক করেছে। কয়েদীরা তাকে সুদামাবাবু বলতো, রঙ্গেশ বলতো যুধিষ্ঠির।

কিন্তু তবুও আমি ভুলতে পারি না যে আমাদের সকলের মণি **unwept, unsung** চলে গেছে। যার রাজার সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে জেলের নির্জন মুর্দাঘরে পড়ে থেকে চলে গেল।

মণি গত দু' বছরে ফতেগড়কে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছিল। ফতেগড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমাকে ছেড়ে থাকার দুঃখ সে সহ্য করতে রাজী ছিল। কিন্তু ফতেগড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ সে পেলো না। তার সৎকার হলো এখানেই। কিন্তু তবুও ফতেগড় এই বন্দী বীরকে চিরকাল বেঁধে রাখতে পারলো না। মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দিল। তাঁর দেহ-ভস্ম গঙ্গার জলে ভেসে নিশ্চয়ই তার প্রিয়তম কাশীতে গিয়ে পৌঁছবে। যখন তার দেহ-ভস্ম পাঁড়ে-ঘাটের পাষাণ বুকে গিয়ে স্পর্শ করবে তখন প্রিয় সন্তানহারা জাহ্নবীর বুক থেকে কি হাহাকারই না উঠবে! পাঁড়ে-ঘাটের পাষাণবাঁধা বুকও সেদিন সে প্রবাসী সন্তানের ভস্মস্পর্শে ফেটে চৌচির হয়ে কি যাবে না? গভীর শোকে জাহ্নবী সেদিন নিশ্চয়ই উদ্দাম হয়ে উঠবে, বারবার তার ঢেউগুলো কানাকানি করবে "নেই সে নেই।"

১৯৩৩ সালের ২৯শে মে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করলেন। সরকারের কাছ থেকে সামান্য কয়েকটা সর্ত আদায়ে তুষ্ট না হয়ে তিনি আইনঅমান্য আন্দোলনের গতি ভিন্নমুখী করলেন। অর্থাৎ "যারা সমর্থ আর ইচ্ছুক তাদের ব্যক্তিগত অমান্যআন্দোলন করতে বললেন।" গান্ধীজী নিজেই এই আন্দোলন পরিচলনা করলেন। ১৯৩৩ সালের ১লা আগস্ট রাস গ্রামে গান্ধীজী যাত্রা করবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তার আগের রাতেই তিনি আর তাঁর চৌত্রিশজন বন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। চতুর্থ দিন সকালে তিনি ছাড়া পেলেন। তাঁকে হুকুম দেওয়া হলো: যায়বেদা গ্রামের সীমানা ছেড়ে পুণায় এসে বাস করতে। গান্ধীজী এ আদেশ মানলেন না। কাজেই ছাড়া পাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ধরা পড়লেন এবং তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। এতে আইনঅমান্য আন্দোলন আবার আরম্ভ হলো এবং হাজার হাজার লোকের জেল হতে লাগলো। গান্ধীজী জেলেই ছাড়া পাবার পরের সুবিধাগুলি

চাইলেন। সরকার তা পূরণে স্বীকৃত না হওয়ায় গান্ধীজী আবার অনশন আরম্ভ করলেন। ২০শে আগস্ট তাঁর অবস্থা এত খারাপ হলো যে তাঁকে পুণা হাসপাতালে পাঠান হলো। ২৩শে আগষ্ট তাঁর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে বিনাসর্তে মুক্তি দিলো সরকার। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী আইন-অমান্য আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করলেন। বিবৃতিতে বল্‌লেন—"গত জুলাইএ আমি পুণায় বলেছিলাম যে বহু আইনঅমান্যকারী যোদ্ধার যদিও আবশ্যক আছে, তবুও সত্যাগ্রহের বাণী বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একজন যোদ্ধাই যথেষ্ট। বহু হৃদয় অন্বেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যদি আইন অমান্যকারীর দরকার হয় তবে আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবো।"

১৯৩৫ সালে সরকার আরও এক কিস্তি সংস্কার দিলেন। ১৯৩৫ সালে ভারত আইনে ঐ নূতন আইনের সংস্কার পাওয়া গেল। কংগ্রেস নির্বাচনে যোগ দিয়ে হিন্দু আসনের বেশীর ভাগ জয় করলো। হিন্দুপ্রধান প্রদেশেও কংগ্রেস মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন! মুসলমান প্রধানপ্রদেশে মুসলমান পার্টি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলো।

অন্য জেলের চেয়ে নৈনীর জীবন আলদা ছিল। আমি নৈনীতে পৌঁছলে দেখলাম যে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের সংখ্যা খুব বেশি। এদের মধ্যে খুব কমই খাঁটি ইউরোপীয়ান্‌, বাকী সব ইঙ্গ-ভারতীয় আর ভারতীয় খৃস্টান। এই বন্দীদের মধ্যে দু'জন ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। তারা নিম্নলিখিত উপায়ে ধরা পড়েঃ তাদের Garrision জব্বলপুরের কাছে কোথাও ছিল। একজন সৈন্য কাছের গ্রামে গিয়ে বোধহয় কোনো মেয়ের ওপর অত্যাচারের চেষ্টা করে। তাতে গ্রামবাসিরা তাকে ধরে বেদম প্রহার দেয়। তাঁবুতে ফিরে সেই সৈনিক প্রবরটি এমন গল্প করে যে সমস্ত Garrisionটাই সে রাতে গ্রামের ওপরে চড়াও হয়, বাড়ী পোড়ায়, সম্পত্তি লুঠ করে আর মেয়েদের ধর্ষণ করে। এ সময়ে ভারতীয় প্রেসে এ বিষয়ে এত আলোচনা হয়, যে সরকার বিচারের একটা প্রহসন করতে বাধ্য হয়। এইমত একটা বিচার খাড়া হয়, আর আটজন সৈন্যের

শাস্তি হয়। তাদেরই দু'জনকে নৈনী পাঠান হয়।...তাদের কথা শুনে আমি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম কেননা, এ বিষয়ে আমি অনেক পড়েছিলাম। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়েই এগিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে মিশে দেখলাম যে তারা ইউরোপীয় অপরাধীদের চেয়ে ঢের বেশী নীতিজ্ঞানসম্পন্ন আর সরল গ্রাম্যযুবক। তাঁরা ইংলণ্ডের গাঁয়ের গরীবলোক, তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে প্রেমিকা আছে; ফিরে বিয়ে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাদের কাছে জব্বলপুরের গাঁয়ের ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। তারা স্বীকার করলো যে তাদের ভুল হয়ে গেছে। তারা জানতো যে ভারতীয়রা কাপুরুষ আর তাদের স্ত্রীরা বেশ্যা। কাজেই এসব স্ত্রীলোকদের ওপর এরকম ব্যবহার করাটা তারা দোষের মনে করেনি। ভারতীয়ের পক্ষে এমন অবস্থা বিশ্বাস করা কঠিন যে তারা ভারতীয়দের সম্বন্ধে এতখানি অজ্ঞ। কিন্তু এটাই সত্য ঘটনা। সংস্কৃতির দিক্ দিয়ে তারা ভারতীয় বন্দীদেরই সমান ছিল। প্রথমে আমি তাদের কথাবার্তা বুঝতাম না, কিন্তু পরে বুঝতে পেরে এটা উপভোগই করতাম। শীঘ্রই তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেলো। প্রায়ই তারা আমাদের সেলে আসতো, আমিও যেতাম। তারা খুব ভালো ডেক-টেনিশ খেলতো, অন্য খেলাও ভালো জানতো। যে ইংরেজ সৈন্য ভারতীয় গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা একটু আশ্চর্যের বলেই কি মনে হচ্ছে না?

'বি'-ক্লাস বন্দীদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ নিগম বলে একটী নোতুন লোক ছিল। বেরিলা জেলে থাকবার সময় তার সঙ্গে এম্. এন. রায়ের আলাপ হয়। ১৯৩২ সালে তিনি যখন ধরা পড়েন তখন মিঃ রায় ছিলেন ভারতীয় মার্কস-বাদিদের গুরু। নিগাম তাই তাঁর কাছ থেকে মার্কসবাদ শেখবার সুযোগ পায়। মিঃ রায়ের কাছ থেকে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সে কয়েকটা দামী নোট আনে। এই নোটগুলি পড়ে আমি খুব খুসী হই। বুখারীণের "ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ" ছাড়া মার্কসবাদ সম্বন্ধে খুব কম বই-ই আমাদের কাছে আসতো। কাজেই যে সব বই সে এনেছিল তাতে আমার খুব উপকার হল। শ্বেতাঙ্গ ব্যারাকেও খুব ভালো ভালো বই ছিল। কয়েকটি বই খুবই ভালো ছিল এবং তাতে বিজ্ঞান,

দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে একেবারে আধুনিকতম তথ্য পাওয়া যেত। আগে সবই নভেল ছিল। ইতিমধ্যে ফিলিপ স্প্র্যাট্ বলে এক ইংরেজ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হয়ে এখানে আসে। সে এখানের লাইব্রেরিয়ান হয়। তার নির্বাচিত সব বই এখানে আসতো। এখন থেকে আমি বিজ্ঞান আর মার্কসবাদ পড়তে লাগলাম।

এই লেখাপড়ার মধ্যেই আমি খবর পেলাম যে নৈনীর মেয়ে-জেল খালি করে নোতুন তারের বেড়া দিয়ে বিপ্লবীদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। জায়গাটাকে তৈরী করবার জন্যে তিনমাস সময় লাগলো। তারপর সমস্ত প্রদেশ থেকে 'বি'-ক্লাস বন্দীদের জড়ো করে এখানে আনা হলো। এখানে ব্যাড্‌মিণ্টন আর ভলিবল খেলবার ব্যবস্থা ছিল। আমার জানাসোনা বন্দী ছাড়া কয়েকজন নোতুন বন্দীকেও এখানে দেখলাম। এখানেই সাহসী বিপ্লবী কমরেড্ হরেন ধর, বাজপেয়ীকে (কানপুর) দেখলাম। পুলিশের সঙ্গে গুলি ছোঁড়াছুড়িতে তাঁরা ধরা পড়েন। সবসমেত প্রায় একুশ জন বন্দী ছিল। চমৎকার গ্রুপ। প্রত্যেকের পিছনেই বিরাট ইতিহাস। (একজন, Communist Partyর শিব সিং, তিনি বল্‌লেন যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির পথই হলো আসল পথ।) এটাই স্বাভাবিক যে সবাই এই ঠিক্ পথটার কথা জানতে চাইবে। কাজেই শিবসিং তাঁর Partyর প্রতিভূ হয়ে এটা বর্ণনা করতে লাগলেন। অবশ্য পার্টির বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলে তিনি মার্কসবাদ সম্বন্ধেই বলতে লাগলেন। অবশ্য মার্কসবাদ সম্বন্ধে তিনি যা জানতেন অনেক কম্‌রেডই তার চেয়ে বেশী জানতেন ও সম্বন্ধে। তবুও তিনি আকর্ষণীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মতবাদ দিয়ে কাউকে দলে যে আকর্ষণ করতে পেরেছেন, এমন নয়। ভদ্রলোক পরে খুব অসুস্থ হয়ে ছাড়া পান। আমরা শুনেছি, ছাড়া পেয়ে বাইরে বলে বেড়িয়েছেন, যে কাকোরী আর অন্যান্য বন্দীরা জেলে তাঁর ছাত্র ছিলেন। শুনে আমরা খুব কৌতুক করেছি। এরপরে ভদ্রলোক ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে খুব সাংঘাতিক দোষে বিতাড়িত হন।

নৈনী জেলে আমাদের জীবনের বিশেষত্ব কিছু ছিল না। কংগ্রেস নির্বাচনে লড়বার সময় সব রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়,

কাজেই পন্থ মন্ত্রীসভা গঠিত হলে আমাদের ছেড়ে দেবার জন্যে তাঁদের ওপর জোর দেওয়া হয়। শেষ অবধি এই দাবির চাকা অপ্রতিরোধনীয় হয়ে ওঠে। বন্দীর অনশন আমাদের ছাড়া-পাবার আন্দোলনকে জোরদার করে। শেষ অবধি ১৯৩৭ সালের ২৪শে আগস্ট সমস্ত কাকোরী বন্দী ছাড়া পেলাম। তুবলীশজীকে ছাড়া পেতে আরও কিছু দেরী করতে হয়। কেননা তিনি ছিলেন আন্দামানে, তাই তাঁকে ছাড়াতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। এই ভাবে বারোবছর পরে জেল থেকে আমরা ছাড়া পেলাম। পন্থমন্ত্রী-সভা যে আমাদের ছেড়ে দেবে এ খবর আগেই সর্বত্র পৌঁছেছিল এবং আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নৈনী জেলের সামনে সত্যিই যুবকরা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল। এই অভ্যর্থনাদলের মধ্যে সবাই ছিল— সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী, কংগ্রেসবাদী, সবাই। পণ্ডিত জওহরলাল নিজে কাকোরী-বন্দীদের চাযে নেমতন্ন করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে আমরা নোতুন পৃথিবীর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাই তিনি আমাদের কাছে স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে নানাকথা উত্থাপন করলেন এবং আমাদের তখনই কোনো মন্তব্য প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন।

বিকেলে এলাহাবাদে একটা জনসভা ছিল, এতে মুক্ত কাকোরী বন্দীদের শুভেচ্ছা জানান হলো। এলাহাবাদে পণ্ডিত পরমানন্দ কাকোরী বন্দীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দু'মাস আগে লাহোর জেল থেকে একুশ বছর পর তিনি ছাড়া পান। এরপর কাকোরী বন্দীরা গেলেন কানপুরে।

বিপ্লবী বন্দীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে হাজার হাজার লোক স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে মিছিল বেরুলো, সহর ফুল দিয়ে সাজান হলো, আর বিপ্লবীদের নামযুক্ত প্রায় শ'খানেক গেট তৈরী হলো। জনসাধারণই এই গেট নির্মাণের ব্যয় বহন করলো। জনসাধারণ যে তাদের শহীদদের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে এতে আমরা খুবই খুসী হলাম। বিকালে বন্দীদের সম্মানে এক বিরাট মিটিং হলো, সহরে তাঁরা দু'দিন রইলেন। প্রায় একশ' জায়গায় তাঁরা অভ্যর্থনা পেলেন। এখান থেকে তাঁরা গেলেন লক্ষ্ণৌ-এ। এখানেও অভ্যর্থনা হলো অন্যান্য জায়গারই

মতো। সেই লক্ষ্ণৌ, এখানেই কাকোরী মাম্‌লা হয়েছিল, আবার এখানেই বিজয়ী বীরের মতো আমরা ফিরে এলাম। এখানের মিটিং-এ আচার্য, নরেন্দ্র দেও সভাপতিত্ব করলেন। এ সময়ে তিনি আর কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক নন, নাম করা কংগ্রেসকর্মী। কাশীতেও এই ব্যাপারে ঘটলো, ওয়ার্ধা থেকে এই সব লক্ষ্য করে মহাত্মাজী ভারী বিচলিত হয়ে পড়লেন। একটি বিবৃতিতে তিনি বললেন যে এসব অভ্যর্থনায় হিংসাকেই অনুমোদন করা হচ্ছে। এ অভ্যর্থনা যদি এত বিরাট আকার ধারণ না করতো তবে গান্ধীজী এটা লক্ষ্য করতেন না। কিন্তু এটা বিরাট আকার ধারণ করাতেই গান্ধীবাদের একটা বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। কাজেই গান্ধীজীকে এই বিবৃতি দিতে হলো। আমাদের আগে ভগৎ সিং আর যতীনদাস বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁদের জনপ্রিয়তা বোধহয় আমাদের চেয়েও বেশী ছিল। গান্দীজী এটা কিন্তু নীরবেই সহ্য করেছিলেন। এর কারণ হলো এই যে সে সময়ে অভ্যর্থিত ব্যক্তিরা গান্ধীজীর আদর্শবাদ এবং power politics এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি। কিন্তু আমরা হলাম জীবন্ত, কাজেই দৈনিক রাজনীতিতে আমাদের প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে। অভ্যর্থনার উত্তরে আমরা স্পষ্টই জানিয়েছিলাম যে দক্ষিণপন্থীদের পাশে এসে আমরা দাঁড়াব না। কাজেই গান্ধীজী এই বিবৃতি না দিয়ে পারেন নি। অবশ্য গান্ধীজীর বিবৃতি সত্ত্বেও দেশে আমাদের অভ্যর্থনার বেগ থামলো না। আমরা অহিংস কি সহিংস—এটা দেশবাসীর বিচার্য ছিল না। দেশের মুক্তিসাধনায় আমরা অকুতোভয়ে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, এটাই ছিল তাদের প্রেরণার উৎস। জনসাধারণ তাই আমাদের নামে উৎসাহিতই হ'ল। কর্মতঃ ও মর্মতঃ যারা অহিংসাবাদী তারাও হ'ল।